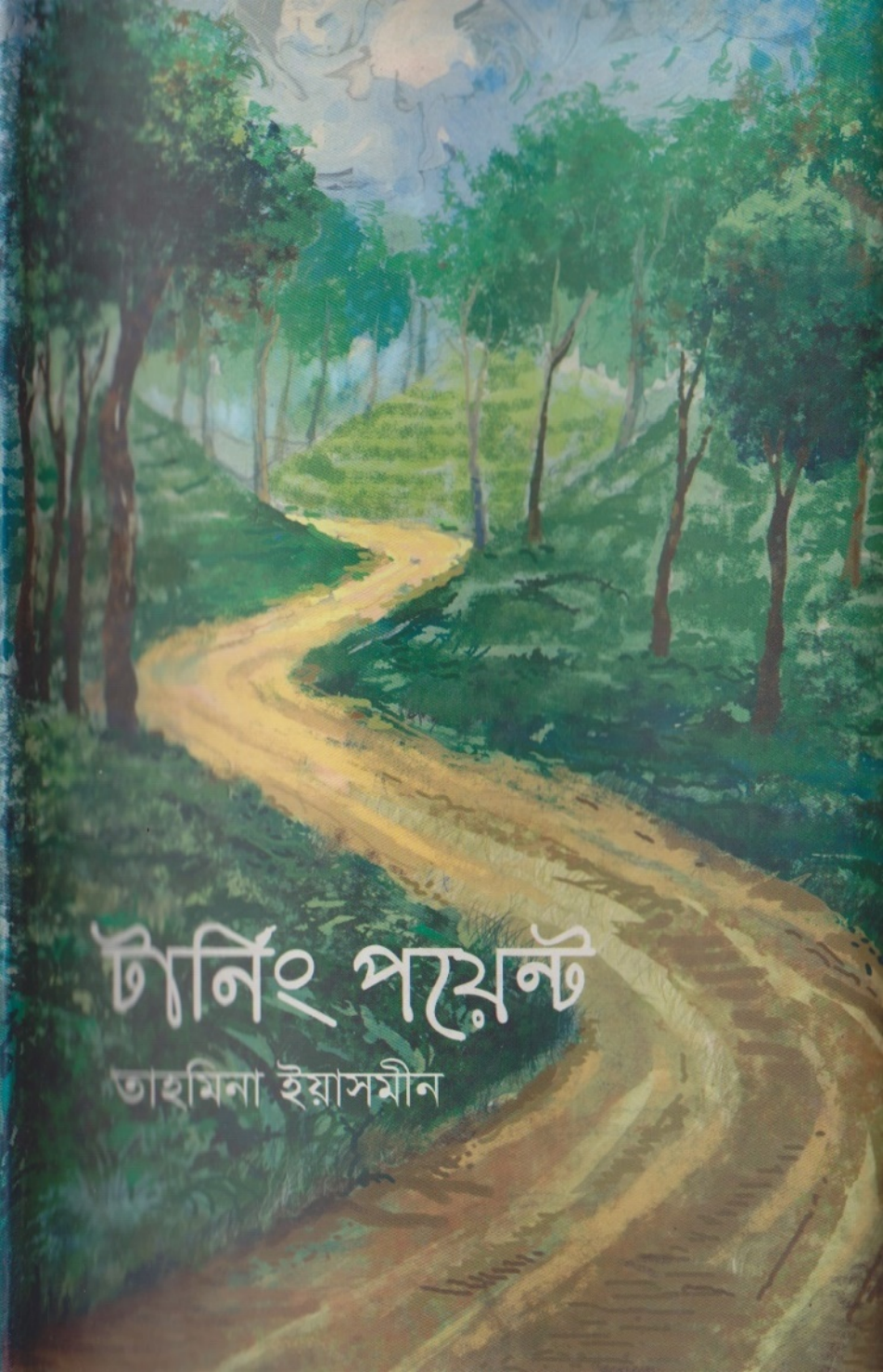
টার্নিং পয়েন্ট
তাহমিনা ইয়াসমীন

গল্প সাহিত্যের একটি অন্যতম শাখা। এখানে আবহমান জীবন প্রতিফলিত হয়। *তাহমিনা ইয়াসমীন* বিজ্ঞানের ছাত্রী হয়েও নিরলসভাবে সাহিত্যচর্চা করে চলেছেন। সাহিত্যের মাধ্যমে তিনি আমাদের মূল্যবোধের অবক্ষয়কে তুলে ধরে পরিশীলিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। আত্মশুদ্ধচেতনা সমৃদ্ধ মনোভাব থেকে সৎ ও সৃজনশীল জীবনের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। *টার্নিং পয়েন্ট* তার প্রথম প্রচেষ্টা। পাঠক-সমাজ একদিকে যেমন আনন্দ পাবেন অপরদিকে তাদের মন ও মানস সুস্থ চিন্তায় উজ্জীবিত হবে।

www.pathagar.com

ব্রহ্মপুত্র বিধৌত জামালপুর জেলার লোন্দহ গ্রামে ১৯৬৩ সালে লেখিকার জন্ম। দু'কূল ভাঙ্গা উত্তাল ব্রহ্মপুত্রের আদর সোহাগে কেটেছে তার শৈশব ও কৈশর। তিনি জামালপুর জেলার ঐতহ্যবাহী সিংহজানী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৭৮ সালে এসএসসি এবং ১৯৮০ সালে আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা থেকে এইচএসসি পাস করেন। ইডেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে ১৯৮৩ সালে বিএসসি অনার্স (প্রাণীবিদ্যা) এবং ১৯৮৪ সালে এমএসসি (ফিসারিজ) পাস করেন। ১৯৯৪ সালে তিনি মানারাত ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল কলেজে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানে বায়োলজি ডিপার্টমেন্টে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করার ব্রত নিয়ে তিনি এগিয়ে চলেছেন। তার লেখনীর মধ্যেও তার জীবনের এই ব্রত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

প্রচ্ছদ : সানজিদা আক্তার
ISBN : 978-984-8955-15-4

www.pathagar.com

টার্নিং পয়েন্ট

তাহমিনা ইয়াসমীন

www.pathagar.com

আ-১৪/গ-০২

টার্নিং পয়েন্ট

তাহমিনা ইয়াসমীন

প্রথম প্রকাশ
একুশে গ্রন্থমেলা ২০১২

প্রকাশনায়
আত্মপ্রকাশন
পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
মুঠিকথা : ০১৮১৯-৫১৫১৪১
০১৭১৪-৫৭৯০৮২, ০১৭১৫-১২৭৮৭২

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সানজিদা আক্তার

বিনিময়
একশত ত্রিশ টাকা

TURNING POINT
A Collection of Stories by TAHMINA YEASMEEN
Published in Ekushe Grontha mela 2012 by ATTAPROKASHON
Pallobi, Mirpur, Dhaka-1216
Phone : 01819-515141, 01714-579082, 01715-127872
Price : 130/- US $ 5

ISBN : 978-984-8955-15-4

www.pathagar.com

উ । ৎ । স । র্গ

আমার মা সুফিয়া খাতুন কে
যাঁর অনুপ্রেরণা ও দোয়া
আমার নিত্যসঙ্গী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

গল্পসূচি

টার্নিং পয়েন্ট ০৯
বাবাকে খুঁজে ফিরে ১৪
একদিন বোটানিক্যাল গার্ডেনে ১৮
ফিরে আসা ২৩
অনুপ্রেরণা ২৮
সাগরকন্যার ভালোবাসা ৩২
আমি সেই মায়শা ৩৭
আমার আপু ৪০
বেঁচে আছে আজো মানবতা ৪২
বিচিত্র পৃথিবী ৪৫
ধৈর্য ৫০
সুন্দরের হাতছানি ৫৩

www.pathagar.com

www.pathagar.com

টার্নিং পয়েন্ট

ঘড়ির কাঁটা চারটা স্পর্শ করা মাত্রই ক্রিং ক্রিং শব্দে বেজে উঠলো মিসেস রায়হানের ছোট্ট টেবিলঘড়িটি। গ্রীষ্মের ক্লান্ত দুপুরে তড়িঘড়ি করে কাজ সেরে একটু ঘুমিয়ে নেওয়া তার দীর্ঘদিনের অভ্যাস। ওদিকে বিকেল পাঁচটায় তাকে একটি জরুরি প্রোগ্রামে যেতে হবে বলে তিনি এলার্ম দিয়ে রেখেছিলেন। এই ছোট্ট ঘড়িটি তার অনেক প্রিয়, কারণ এটি তাকে দ্বীনের কাজে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে থাকে। রাতের শেষাংশে আল্লাহতায়ালার ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য এ ঘড়িটিই তাকে জাগিয়ে তোলে।

বিছানা ছেড়ে উঠে মিসেস রায়হান প্রয়োজনীয় কিছু কাজ সেরে অজু করে নিলেন। ব্যাগ-পত্র গুছিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগে তার একমাত্র মেয়ে পাঁচ বছরের মিমকে কোলে তুলে আদর করছিলেন। এমন সময় রান্না-ঘরের পাশের ছোট গ্রিলের দরজায় একটি শব্দ শুনতে পেলেন। এ দরজাটি সাধারণত ব্যবহার করেন তার অনেক যত্নে লালিত সবজিগাছের পরিচর্যা করার জন্য। মিসেস রায়হানের এ বাড়িটি আট কাঠা জমির উপর করা। বাড়ির সামনে পিছনে অনেক জায়গা ছেড়ে দিয়ে করা হয়েছে। চার বেডের এক ইউনিটের একটি বাড়ি। রায়হান সাহেবও সবজি বাগান করতে বড্ড ভালোবাসেন। তাই তারা দুজন মিলে প্রতিদিন ফজরের নামাজ শেষে এবং সন্ধ্যায় গাছপালা পরিষ্কার করা, পানি দেয়া ও নিড়ানির কাজগুলো সেরে থাকেন। পুরো জায়গাটুকু উঁচু দেয়ালে ঘেরা বলে মিসেস রায়হানের সেখানে কাজ করতে অসুবিধা হয় না। রায়হান সাহেব স্থানীয় কৃষি ফার্মের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে বাড়ির সামনের জায়গাটুকুকে কয়েকটি প্লটে ভাগ করেছেন, যেখানে তিনি মওসুম উপযোগী

www.pathagar.com

সবজির চারা লাগিয়ে থাকেন। এই চারাগুলোও তিনি সংগ্রহ করেন ফার্মের উন্নত মানের বীজ থেকে। মাঝে মাঝে তিনি একজন লোক রাখেন যে তার বাগানের জন্য কিনে আনে এক ট্রলি সবুজ সার এবং সারাদিন বাড়ির আঙ্গিনা পরিষ্কার করা থেকে শুরু করে গাছপালাগুলোর বিশেষ যত্ন নেয়াও তার দায়িত্ব। রায়হান সাহেবের উৎপাদিত বেগুন, শিম, ঢেঁড়স, লাউ, কুমড়ো সবই এলাকায় সুনাম কুড়িয়েছে।

গ্রিলের দরজার শব্দটি আবারও শুনতে পেলেন মিসেস রায়হান। এবার তিনি বুঝতে পারেন শব্দটি কারও নক করার শব্দ। অবাক হলেন মিসেস রায়হান। কারণ এ দরজায় কাউকে আসতে হলে পাশের বাসার ভিতর দিয়ে ঢুকে ওয়াল টপকিয়ে আসতে হবে। দিন-দুপুরে কে এভাবে আসতে পারে! তিনি আরও অবাক হলেন যখন দেখলেন গ্রিলের বাইরে দাঁড়িয়ে নক করছে একটি পনের ষোল বছরের সুন্দরী অচেনা মেয়ে। তিনি দ্রুত এগিয়ে গেলেন। দেখলেন মেয়েটি ভয়ে কাঁপছে আর ফিসফিস করে বলছে, আপা প্লিজ, আমাকে একটু ভিতরে আসতে দিন। আমি খুব বিপদে পড়েছি। আমাকে বাঁচান। একদল ছেলে মোটরসাইকেল নিয়ে আমাকে তাড়া করেছে।

দরজায় তালা দেয়া থাকায় মিসেস রায়হান তাড়াতাড়ি চাবি এনে মেয়েটিকে ঘরে ঢুকালেন। আবার ভয়ও পাচ্ছেন এই ভেবে যে, না জানি মেয়েটি কোন্ প্রকৃতির। সে কি সত্যিই বিপদে পড়েছে? নাকি মিথ্যা বলে তাকে প্রতারণা করছে? দরজাটি খোলামাত্র মেয়েটি হুড়মুড় করে বাসার ভিতরে ঢুকে পড়লো এবং সোজা হেঁটে ভিতরে গিয়ে ডাইনিং রুমের ফ্লোরে বসে পড়লো। মিসেস রায়হান পিছে পিছে ছুটে গেলেন এবং প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগলেন।

'কোথা থেকে এসেছো?'

'তোমার নাম কি?'

মেয়েটি হাঁপাচ্ছে আর জবাব দিচ্ছে।

'আপা আমার নাম ফারজানা। আমার বাসা পাশের পাড়ায়। আমি ক্লাস টেন-এ পড়ি। একটি ছেলে আমাকে বিয়ে করতে চায়। সে প্রতারণা করে আমাকে নিয়ে এসেছে ওদের বাড়িতে। জোর করে বিয়ে পড়াতে চাচ্ছে। আমি ওদের বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি। পিছে পিছে সেই ছেলে ও তার বন্ধুরা আসছে আমাকে ধরে নিয়ে যাবে বলে। ওরা ওদের বাড়িতে কাজি ডেকে এনেছে। ছেলেটি কিছুই করে না। বখাটে। আপা প্লিজ। আমাকে ঐ ছেলেদের হাতে ছেড়ে দেবেন না। ওরা আমার উপর প্রতিশোধ নেবে।'

www.pathagar.com

মিসেস রায়হান পড়ে গেলেন বড় বিপাকে। কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। ওদিকে রায়হান সাহেবও অফিসে। ফিরে আসতে পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা বেজে যাবে। অগত্যা তার জরুরি প্রোগ্রামটি ক্যান্সেল করে বাসায় থাকতে হলো।
রায়হান সাহেবের বাড়ির পূর্ব ও উত্তর দিকে চওড়া রাস্তা। মিসেস রায়হান উত্তর দিকের জানালা দিয়ে দেখতে পেলেন রাস্তায় কয়েকজন ছেলে অস্থিরভাবে আনাগোনা করছে আর এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। তিনি আস্তে করে জানালাটি ভেজিয়ে দিলেন। জানালার দুইটি পার্ট থাকায় উপরের পার্টটি থাকলো খোলা। তিনি কিছুক্ষণ পর যখন জানালা দিয়ে উঁকি দিলেন তখন দেখতে পেলেন যে, রাস্তায় ততোক্ষণে অনেক লোক জড়ো হয়ে গেছে। তাদের কেউ কেউ আশপাশের বাসাগুলোতে ঢুকে খুঁজছে মেয়েটিকে। অবশেষে তারা ধরে নেয় যে, মেয়েটি রায়হান সাহেবের বাসায়ই ঢুকেছে। বাসার মেইন গেইটটি পূর্ব দিকের রাস্তার সাথে। মিসেস রায়হান তার ড্রইংরুমের জানালা দিয়ে দেখতে পেলেন যে, গেইটের সামনের রাস্তায় অনেক লোক জমে গেছে। দুই রাস্তা মিলে শ'খানেক লোকতো হবেই। ভড়কে গেলেন তিনি। বাড়িতে লোক বলতে তার কলেজে পড়া ভাতিজি, কাজের মেয়ে ও ছোট্ট মিম। কূল-কিনারা না পেয়ে মিসেস রায়হান কায়মনবাক্যে আল্লাহকে ডাকতে লাগলেন। এ বিপদ থেকে একমাত্র তাকে আল্লাহপাকই পারেন রক্ষা করতে, আর রায়হান সাহেবের জন্য পথ পানে চেয়ে রইলেন।

রায়হান সাহেব এ এলাকায় থাকেন দীর্ঘদিন। এলাকায় তিনি একজন সৎ ও ধর্মভীরু– ইসলামের বাস্তব অনুসারী বলে পরিচিত। সেই সুবাদে এলাকার ছোট বড় সবাই তাকে বেশ সমীহ করে চলে। তাই বাসার ভিতরে কোনো পুরুষ অনুমতি ছাড়া ঢুকে যাবে এটা অসম্ভব। যদিও অপেক্ষমাণ ছেলেদের বেশিরভাগই ছিলো উচ্ছৃঙ্খল, তথাপি বাইরে দাঁড়িয়ে মেয়েটি বের হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় ছিলো না।
বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে বাইরে শোনা গেলো রায়হান সাহেবের মোটর সাইকেলের আওয়াজ। মিসেস রায়হান যেনো হালে পানি পেলেন। রায়হান সাহেব জনতার ভিড় ঠেলে বাসার ভিতরে প্রবেশ করলেন। কোনো মন্তব্য না করে সোজা চলে গেলেন মিসেস রায়হানের কাছে, ঘটনা কী তা জানার জন্য। তিনি ফারজানার সাথেও কথা বললেন, জেনে নিলেন প্রকৃত ঘটনা।

মিসেস রায়হান স্বামীকে বললেন, 'দেখো প্রকৃত ঘটনা আল্লাহপাকই ভালো জানেন। তবে আমরা এই মেয়েকে কোনো অবস্থায়ই ঐ ছেলেদের হাতে ছেড়ে

www.pathagar.com

দিতে পারি না। যে করেই হোক ওকে ওর আত্মীয়-স্বজনের হাতে তুলে দিতে হবে।'

মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করায় সে তার বোনের বাসার ফোন নাম্বার দিলো। রায়হান সাহেব সেই নাম্বারে ফোন করে দিলেন। তারপর তিনি এগিয়ে গেলেন ছেলেদের মাঝে। অল্প বয়স্ক এসব ছেলেদের পিঠে হাত দিয়ে আদর করে বুঝিয়ে মেনেজ করার অপূর্ব দক্ষতা আছে রায়হান সাহেবের। তিনি ছেলেদের একটু ধৈর্য ধরতে বলে এলাকার মুরুব্বিদের নিয়ে বসে গেলেন এ ব্যাপারে পরামর্শ করার জন্য।

এদিকে মিসেস রায়হান ফারজানার সাথে কথা বলছিলেন। মিম দৌড়ে গিয়ে তার মায়ের একটি ওড়না নিয়ে এলো এবং ওড়নাটি দিয়ে মাথা পেঁচিয়ে নেকাব দেয়ার চেষ্টা করতে লাগলো। পাঁচ বছরের এই মিম মা-বাবার খুবই ভক্ত। সে তার মা-বাবার প্রতিটি কাজ অনুকরণ করে থাকে। আল্লাহর মেহেরবানীতে স্মরণশক্তিও খুব প্রখর। যা সে একবার শোনে ও দেখে তার সবই মনে রাখে। ছোটবেলা থেকেই মা-বাবার সাথে পাশে দাঁড়িয়ে তার ছোট্ট জায়নামাজে নামাজ পড়ে। নামাজ শেষে রায়হান সাহেব ও মিসেস রায়হান সাধারণত একটু উঁচু স্বরে মোনাজাত করেন যখন মিম তাদের পাশে থাকে। এতে করে মিম মা-বাবার মোনাজাতের ভাষাগুলোও মুখস্থ করে ফেলেছে। কখনও কখনও রায়হান সাহেব নামাজ শেষ করে মেয়েকে মোনাজাত করতে বলেন। মিম তার কচি মুখে গুছিয়ে গুছিয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে। কোনো কোনো সময় এমনভাবে সে মোনাজাতে কাঁদতে থাকে যে তার ছোট্ট মুখটি চোখের পানিতে ভিজে যায়। কান্নার আবেগে ছোট্ট শরীরটি এদিকে-ওদিকে দুলতে থাকে। নামাজ শেষে রায়হান সাহেব ও মিসেস রায়হান বুকে নিয়ে আদরে আদরে ভরে দেয় তাদের নয়নমণিকে। প্রাণ খুলে দোয়া করেন তার দোজাহানের কল্যাণের জন্য। এমনিভাবেই মিমের ভিতর ঈমানী বৃক্ষ পল্লবিত হতে থাকে।

মিম বারবার মাকে বলছে, 'আম্মু আমাকে এই ওড়নাটি দিয়ে সুন্দর করে নেকাব দিয়ে দাও।'

মা বললেন, 'কেনো মা? তুমি ওড়না পরে কী করবে?'

মিম জবাব দিলো, 'আমি বাইরে দেখবো। তা না হলে তো ওরা আমাকে দেখে ফেলবে। আমার অনেক গুনাহ হবে না আম্মু!'

মিসেস রায়হান মেয়েকে ওড়না দিয়ে সুন্দর করে নেকাব দিয়ে দিলেন। মিম বড়দের মতো ওড়নার এক কোণা টেনে টাইট করে ধরে খাটের উপরে উঠে চুপি

www.pathagar.com

চুপি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখছিলো। মিমের বুদ্ধিদীপ্ত দুটো চোখ নেকাবের ফাঁক দিয়ে দূর আকাশের ছোট্ট দুটো তারার মতোই জ্বলজ্বল করছিলো। মিমের এই অবস্থা দেখে মেয়েটি অবাক হয়ে গেলো। সে জিজ্ঞেস করলো, 'মিম মুখ ঢেকে অমন করছে কেনো? জবাবে মিসেস রায়হান বললেন, 'বোন, তুমিও যদি মিমের মতো বুঝতে পারতে তাহলে আজ তোমার জীবনে এমন ঘটনা ঘটতো না। তুমি আল্লাহর বিধানকে লংঘন করেছো। মুসলিম নারীর উপর আল্লাহ পর্দা ফরজ করেছেন। তুমিও যথেষ্ট বড় তাই তোমার উপরও পর্দা ফরজ। আল্লাহপাক নারী ও পুরুষের মধ্যে যে সীমারেখা টেনে দিয়েছেন তা তুমি লংঘন করে ছেলেদের সামনে নিজের সৌন্দর্যকে প্রকাশ করেছো, যার মূল্য আজ তোমাকে দিতে হচ্ছে। ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি, যুগে যুগে যখনই মানুষ আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করে স্বেচ্ছাচারী জীবন যাপন করেছে তখনই তাদের জীবনে নেমে এসেছে বিপর্যয়। আজ যদি তুমি নিজেকে আবৃত করে রাখতে তাহলে তোমার রূপসৌন্দর্য কেউ দেখতে পেতো না এবং তুমি নিজেকে বখাটে ছেলেদের উৎপাত থেকে বাঁচাতে পারতে। সেই সাথে বাঁচতে পারতে আল্লাহ আজাব থেকে।'

মিসেস রায়হানের এসব কথায় মেয়েটির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললো, 'আপা, পর্দার ব্যাপারটা আপনার মতো করে এভাবে বুঝিয়ে কেউ তো কখনও আমাকে বলেনি। পর্দা যে মেয়েদের জন্য এতোটা জরুরি তাতো আমার জানা ছিল না। আজকের এ ঘটনা আমার জীবনের টার্নিং পয়েন্ট হিসেবে কাজ করবে। আপা, আজ আমি আপনাদের যে সহযোগিতা পেলাম তার কোনো বিনিময় হয় না। আল্লাহ আপনাদের বিনিময় দিন।'

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ ফারজানার বোন দুলাভাই এসে পৌঁছলো। ফারজানার বোন বাসার ভিতরে এসে যেনো ভাষা হারিয়ে ফেলেছেন। বোনকে জড়িয়ে ধরে আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়লেন। কী বলে যে মিসেস রায়হানকে ধন্যবাদ দিবেন বুঝে পাচ্ছিলেন না। শুধু বললেন, 'আল্লাহ আপনাদের হেফাজত করুন। রায়হান সাহেব উভয়পক্ষকে বুঝিয়ে মীমাংসা করলেন। ফারজানাকে যখন তারা ওর বোন দুলাভাই-এর কাছে নিরাপদে তুলে দেন রাত তখন ন'টা।

www.pathagar.com

বাবাকে খুঁজে ফিরে

বৃষ্টির রিমঝিম শব্দ মিষ্টির খুব ভালো লাগে। অনেকদিন ভ্যাপসা গরমের পর আজ হঠাৎ এ বৃষ্টি। মিষ্টির মা বললেন, এটা নাকি রহমতের বৃষ্টি। মিষ্টি তাড়াতাড়ি একটি চেয়ার নিয়ে বারান্দায় গিয়ে বসলো। সন্ধের আলো আঁধারিতে বৃষ্টির সৌন্দর্য উপভোগ করতে ওর খুব ভালো লাগছিলো। সেই সাথে গরম মাটির গন্ধে চারদিকে অন্যরকম এক আবেশের সৃষ্টি হয়েছে। তন্ময় হয়ে মিষ্টি দেখছিলো বসন্তের নতুন পাতাগুলো কেমন বৃষ্টির পানিতে চকচক করছে। হঠাৎ পিছন থেকে গলা জড়িয়ে ধরলো দৃষ্টি। কখন যে ও মিষ্টির পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে তা সে টেরও পায়নি। দৃষ্টি তার আদরের একমাত্র ছোটবোন। নবম শ্রেণীতে পড়ছে। দৃষ্টিটা সব সময় মিষ্টির পিছনে যেনো আঠার মতো লেগে থাকে। ও একটু বেশি আদুরে। ওদের আব্বু-আম্মু সরকারি চাকুরে হওয়ার কারণে সকাল-সন্ধ্যা অফিস করে মেয়েদের জন্য খুব কমই সময় বের করতে পারেন। দৃষ্টির লেখাপড়ার দায়িত্ব, ওকে সঙ্গ দেয়া– সবই মিষ্টির ওপর। মিষ্টি তার কলেজের পড়ার ফাঁকে ফাঁকে ওকে পড়া বুঝিয়ে দেয়। ওর আম্মু বলেন, 'মিষ্টি তোর জন্যই আজ দৃষ্টি ভালো রেজাল্ট করেছে। গত বছর অষ্টমশ্রেণীতে টেলেন্টপুল বৃত্তি পেয়েছে। মিষ্টি আমার সত্যিই মিষ্টি মেয়ে।

আপু দেখো, কী সুন্দর বৃষ্টি। এই বৃষ্টি ভেজা সন্ধ্যায়, তোমার সেই প্রিয় বৃষ্টির গানটি একটু শোনাও না আপু, প্লিজ। দৃষ্টির এসব আবদার মিষ্টিকে প্রায়ই রাখতে হয়। কারণ যতোক্ষণ না সে গানটি কে শোনাচ্ছে ততক্ষণ দৃষ্টি টেপ রেকর্ডারের মতো বলতেই থাকবে।

www.pathagar.com

মিষ্টির আব্বু জাহিদ সাহেব ড্রইংরুমে বসে টিভি দেখছেন। তিনি খুব চুপচাপ প্রকৃতির। অফিস থেকে বাসায় এসে পত্র-পত্রিকায় চোখ বুলানো, টিভি নিউজ দেখা, এসবই তার নিত্যদিনের অভ্যাস। মিষ্টির আম্মু রান্নাঘরে রকমারি খাবার তৈরিতে ব্যস্ত। বিকেলে মৌলভীবাজার থেকে ওর ছোটমামা ফোন করেছেন। নানাভাই খুব অসুস্থ। তাই তারা আগামীকাল বাড়ি যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। মিষ্টির আম্মু তার বাবার জন্য পছন্দের কয়েকটি খাবার তৈরি করছেন। রান্নাঘর থেকে মায়ের ডাকে চিন্তায় ছেদ পড়লো মিষ্টির। 'মিষ্টি, তাড়াতাড়ি কাপড় চোপড়গুলো গুছিয়ে নে মা। আমরা আগামীকাল ফজরের নামাজের পর রওনা হবো মৌলভীবাজারের উদ্দেশ্যে।'

জাহিদ সাহেব গাড়ি ড্রাইভ করছেন। পাশে তার স্ত্রী। তাদের দুই মেয়ে মিষ্টি ও দৃষ্টি পিছনের সিটে বসে রাস্তার দুধারের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখছে। গাড়ি হবিগঞ্জের মেইন রোড থেকে মৌলভীবাজারের দিকে টার্ন নিলো। যতোই অগ্রসর হচ্ছে অপার সৌন্দর্যের লালনভূমি শ্রীমঙ্গল যেনো দৃষ্টি কেড়ে নিচ্ছে। পাহাড়ের ঢালে তাক তাক করে সাজানো চা বাগানের দৃশ্য কার না মন কাড়ে। ফিনলে টি এস্টেট, মির্জাপুর টি এস্টেট ইত্যাদি চা বাগানের হৃদয়কাড়া সৌন্দর্য দেখে মিষ্টি অবচেতন মনে বলে উঠলো, 'আলহামদুলিল্লাহ। হে আল্লাহ! তোমার সৃষ্টি কতোই না সুন্দর!'

দেখতে দেখতে তারা পৌঁছে গেলো গ্রামের বাড়িতে। বাড়িতে অনেক মেহমান। মিষ্টির ছোটখালা এসেছেন কুমিল্লা থেকে। সাথে এসেছে তার ছোট ছেলে অয়ন ও মেয়ে অনন্যা। বড় মামা-মামী এসেছেন চট্টগ্রাম থেকে তাদের বড় মেয়ে সুস্মিতাকে সাথে নিয়ে। ছোট মামা-মামী আর ওদের ছেলে সুমন তো বাড়িতেই থাকে। সব মিলিয়ে বাড়িতে এখন বেশ জমজমাট অবস্থা। সবাইকে পেয়ে মিষ্টির নানাভাই বেশ একটু ভালো বোধ করছেন। গাড়ি থেকে নেমে ওরা দুবোন দৌড়ে গেলো নানাভাই-এর রুমে। সালাম দিয়ে ওরা খাটে শুয়ে থাকা নানাভাই-এর পাশে গিয়ে বসলো। নানাভাই-এর দুটো হাত টেনে নিয়ে চুমু দিলো মিষ্টি। নানাভাইও তার প্রিয় নাতনীকে কাছে টেনে ওর কপালে এঁকে দিলেন অনেক মহব্বতের চুম্বন। মিষ্টির জন্য নানাভাই-এর রয়েছে স্পেশাল ভালোবাসা। বললেন, 'নানুমণি এসেছো? তোমার জন্য আমি পথপানে চেয়ে আছি। আল্লাহর অশেষ রহমত। তিনি আমার নানুমণির সাথে দেখা হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন।'

www.pathagar.com

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে সবাই বিভিন্ন রুমে বিশ্রাম নিতে চলে যায়। এই ফাঁকে নানাভাই একান্তে কাছে ডাকেন মিষ্টিকে। 'নানুমণি, তোমাকে আমি একটি কথা বলবো ভাবছি। এ তোমার জীবনের এক নিষ্ঠুর বাস্তবতা। তারপরও তোমাকে যে আমার তা জানাতেই হবে। আমারও জীবন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তাই ব্যাপারটা তোমাকে আমি বুঝিয়ে বলে যেতে চাই। প্লিজ, নানুমণি, তুমি বাস্তবতাকে সহজভাবে মেনে নাও।'

নানাভাই-এর কথায় মিষ্টির লতানো বাড়ন্ত শরীর যেনো হঠাৎ অজানা এক আশংকায় শিউরে ওঠে। কী বলতে চান নানাভাই! কী সেই নিষ্ঠুর বাস্তবতা? অত্যন্ত উদগ্রীব হয়ে হতবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সে নানাভাই-এর মুখের দিকে।

নানাভাই বাম হাতের তালু দিয়ে নিজের চোখ দুটো মুছে বলতে শুরু করলেন, 'আজ তুমি যাকে আব্বু বলে জানো, সে তোমার জন্মদাতা পিতা নন। তোমার মাকে আমি অনেক জাঁকজমক করে বিয়ে দিয়েছিলাম। উচ্চশিক্ষিত এক ছেলের সাথে। ভালোই চলছিলো ওদের সংসার। তোমার জন্মের পর কী যে হলো, ধীরে ধীরে ওদের সম্পর্কে অবনতি হতে লাগলো। ছোট-খাটো সন্দেহ দানা বেঁধে বেঁধে প্রকাণ্ড এক মহীরুহে পরিণত হলো, যদিও সেই সন্দেহের কোনোটারই কোনো ভিত্তি ছিলো না। সন্দেহ পরিণত হলো অবিশ্বাসে। প্রথম কিছুদিন চললো সাময়িক বিচ্ছেদ, তারপর চূড়ান্ত। বিশ্বাস করো নানুমণি, আমি তা চাইনি। এ আমারই ভাগ্যের নির্মম পরিহাস। আমি অনেক চেষ্টা করেও ওদের বেঁধে রাখতে পারিনি। তুমি আমাদের মাঝে সেই ঘটনার স্মৃতি হয়ে থাকলে।'

নানাভাই দুচোখ মুছে বুকপকেট থেকে ছোট একটি ভাঁজ করা কাগজ বের করে মিষ্টির দিকে বাড়িয়ে বললেন, 'তোমার বাবার স্থায়ী ঠিকানা এতে লেখা আছে। যদি কখনও তোমার জীবনে তাকে প্রয়োজন হয়, খুঁজে নিও। আর শোনো কখনও তুমি তোমার বাবা-মাকে সে জন্য অমর্যাদা করো না, কারণ তারা তাদের শাস্তি পেয়ে গেছে।'

এইমাত্র বয়ে যাওয়া সিডরের তাণ্ডবলীলায় মিষ্টির সারা শরীর কাঁপছে। সারা পৃথিবীতে যেনো কিয়ামতের প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্প শুরু হয়েছে। মিষ্টি দুহাতে মুখ চেপে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে আছড়ে পড়লো নানাভাই এর বুকের ওপর।

www.pathagar.com

নানাভাই আলতোভাবে ওর মাথার উপর হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে বললেন, 'নানুমণি, ধৈর্য ধরো, ইন্নাল্লাহা মা-আসসাবিরিন। আল্লাহ নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। আল্লাহ তোমাকে হেফাজত করুন।'

রাতে মিষ্টি ড্রেসিং টেবিলের বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে ভালো করে পরখ করছে আর পাশে শুয়ে থাকা মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেকে মিলিয়ে দেখছে। তার ধারণা, ওর চেহারার যে দিকগুলো মায়ের সাথে মিল নেই সেটাই হয়তো সে তার বাবার কাছ থেকে পেয়েছে। সেগুলো তাই সে ভালো করে মনে রাখার চেষ্টা করছে, বাবাকে চিনে নিতে এটা যে তার বড় প্রয়োজন।

শ্রীমঙ্গলের যে পথটি গতকাল ওকে মোহাবিষ্ট করে রেখেছিলো, আজ তার কাছে সেটা যেনো লণ্ডভণ্ড এক পৃথিবী। চা বাগানের সারিগুলো এলোপাথাড়ি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে চারদিকে। উদাস দুটি চোখ শুধু বাবাকেই খুঁজে ফিরছে দৃষ্টির সীমানা জুড়ে।

www.pathagar.com

একদিন বোটানিক্যাল গার্ডেনে

শরতের পড়ন্ত বিকেলের মিষ্টিরোদে করিডোরে বসে ফুরফুরে মনে পায়ে আলতা পরছে তিয়া। আনাড়ি হাতে পরা লালশাড়ির আঁচলটা হালকা বাতাসে দোলা খাচ্ছে। গুণগুণিয়ে গান গাইছে আর ভাবছে, কোনো স্মরণীয় ঘটনাকে বিশেষভাবে মনে রাখার জন্য তো মানুষ প্রতি বছর বার্ষিকী উৎযাপন করে থাকে, কিন্তু তিয়া আজ তার বিশেষ একটি দিনের একমাস অতিক্রম করে নতুন মাসে পদার্পণের জন্য তেমনি কোন শব্দ খুব করে খুঁজে ফিরছে। কোনোভাবেই সে কোনো সুইটেবল নাম দিতে পারছে না। যা হোক, নাম থাক বা না থাক ওকে তো আগামীকাল সে রকমই একটি দিন পাড়ি দিতে হবে। স্মৃতির পাতায় ধরে রাখার মতো কিছু একটা করতে চায় সে। কারণ আগামীকাল যে ওর বিয়ের এক মাস পূর্ণ হতে চলেছে। কিন্তু দেবর, ননদ, শ্বশুর, শাশুড়িসম্বলিত তার এ নতুন সংসারে কতোটুকুই বা সুযোগ মিলে স্বামী আলীর সাথে একান্তে গল্প করার। তার উপর ওরা দুজনই চাকরিজীবী হওয়ায় সে সুযোগ তো আরও সীমিত।

তিয়া এমনিতে একটু লাজুক প্রকৃতির, ধর্মভীরু। তার উপর ওর গায়ের মেহেদীর গন্ধই তো এখনো মিলিয়ে যায়নি। বিকেলে কোথাও আলীর সাথে বেড়াতে যাবে সেটাতে ওর বেশ লজ্জা। কী করে বলবে ওর শাশুড়ীর কাছে, ভেবে পায় না।

তাই দুজনে ঠিক করলো অফিস থেকে শর্টলিভ নিয়ে দুপুরের আগেই ওরা চলে যাবে দূরে কোথাও, নির্জন-নিরালায়। চলে যাবে কিছুক্ষণের জন্য প্রকৃতির কাছাকাছি। আলী জিজ্ঞেস করলো,

www.pathagar.com

– বলো তো তিয়া, কোথায় যাওয়া যায়?
সে বললো পুরোনো ঢাকায়।
জানো তো পুরোনো ঢাকায় কেমন জ্যাম হয়? তার চেয়ে চলো হলে গিয়ে সিনেমা দেখে আসি।
আলী অবশ্য এসব কথা তিয়াকে পরীক্ষা করার জন্য বলে থাকে। তাই তিয়াও ঘৃণা মিশ্রিত কণ্ঠে জবাব দেয়,
– ছি! ছি! ওসব কী বলছো? সিনেমা হলে আজকাল কোনো ভদ্র ছেলে-মেয়েরা যায়? ওসব তো পূর্ণ হয় যতো রিকশাওয়ালা, স্কুটারওয়ালা আর গার্মেন্ট শ্রমিক দিয়ে।
– তাহলে চলো না হয় বোটানিক্যাল গার্ডেনে। ওদিকটায় একটু ট্রাফিকজ্যাম কম এবং বাসা থেকেও কাছে।
– তবে তাই চলো। তাহলে হানিমুন না হলেও হানিসান তো কিছুটা হয়ে যাবে এই ফাঁকে।
রসিকতা করে বললো তিয়া।

কথামতো আলী এগারটার মধ্যেই অফিস থেকে বের হয়ে চলে যায় তিয়ার অফিসে। তিয়াও ততোক্ষণে কাজ গুছিয়ে রেডি হয়ে বসেছিলো। তাই তাড়াতাড়ি রাস্তায় নেমে ওরা চড়ে বসলো একটি হলুদ ট্যাক্সিক্যাবে। আলী কালো ট্যাক্সিক্যাবগুলো একদম পছন্দ করে না। কারণ ওগুলোর ড্রাইভার অপটু হওয়ায় খুব ঘন ঘন এক্সিডেন্ট করে। কী করে ওরা ড্রাইভিং লাইসেন্স পায় তা আলীর বুঝে আসে না।

ফুরফুরে দুটি মন নিয়ে ওরা চলছে। মতিঝিলের অফিসপাড়া থেকে মিরপুরের দিকে। মনে এক অপূর্ব অনুভূতি। বিয়ের পর এভাবে তাদের প্রথম ঘুরে বেড়ানো। কষ্টের অনুভূতিরা যেনো বিদায় নিয়েছে অনেক আগেই। এখন সবকিছুই যেনো শুধু ভালো লাগার।

ওরা যখন বোটানিক্যাল গার্ডেনের কাছে পৌঁছে তখন দুপুর সাড়ে বারোটা। সময়টা একটু অড বলে লোকজনও বেশ ফাঁকা ফাঁকা। মাঝে মাঝে গাছের ছায়ায় কপোত-কপোতীরা বসে বসে মনের না বলা কথাগুলো ব্যক্ত করছে বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্ন ভঙ্গিতে। তিয়া আলীর হাত ধরে হাঁটছে বাহারী ফুল গাছের ফাঁক দিয়ে আর বিভিন্নভাবে ছেঁটে সুন্দর করে রাখা গাছগুলোর গায়ে আলতো পরশ বুলাচ্ছে। রকমারি ফুল-পাতার সমাহার ওকে আনন্দে মাতিয়ে

www.pathagar.com

তোলে। ঝিলের ধারে বসে থাকা মাছরাঙা পাখিটাকে উড়ে যেতে দেখে গুনগুনিয়ে ও গেয়ে ওঠে,

যে পাখি পালিয়ে গেলো সুদূরে
যে নদী হারিয়ে গেলো তেপান্তরে
সেই পাখি সেই নদী যদি এতো সুন্দর
না জানি তাহলে তুমি কতো সুন্দর।

আলী চেষ্টা করে তিয়ার গানে তাল দিতে। কিন্তু ওর বেসুরো কণ্ঠ তিয়ার গানে এনে দেয় যেনো তবলার সংযোজন।

তিয়া খুব সুন্দর গাইতে পারে। অল্প দিনেই আলী তার গানের বেশ ভক্ত হয়ে উঠেছে। আর তাই আলীর কণ্ঠে তিয়ার গলা ও গানের প্রশংসা,
– প্রকৃতির এ সৌন্দর্যের মতো তোমার কণ্ঠও যেনো আল্লাহর এক অপূর্ব সৃষ্টি। আরও ভালো লাগে তোমার কণ্ঠে স্রষ্টা ও তার সৃষ্টির গান। শরীয়তের বিধি-নিষেধ না থাকলে আমি হয়তো রেডিও-টিভিতে তোমাকে দিয়ে গান গাওয়ানোর লোভ সামলাতে পারতাম না। আজকাল শিল্পীরা যে কী সব গান গায়, আমার একটুও ভালো লাগে না। সে সব গানের সুর আর কথায় কোনো আবেগ নেই। তোমার সুরের মোহিনী শক্তি তার চেয়ে অনেক বেশি যাদুকরী।

এসব গল্পের এক পর্যায়ে হঠাৎ একটি আর্তচিৎকারে তারা স্তব্ধ হয়ে যায়। কোথা থেকে আসছে এই নারীকণ্ঠের আর্তনাদ? পিছন ফিরে তাকিয়ে তিয়া ও আলী ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যায়। নির্বাক বিস্ময়ে তারা তাকিয়ে থাকে। দশ বারোজনের একটি সন্ত্রাসী দল একটি ছেলেকে খুব করে পিটাচ্ছে আর তারই পাশে তার সালোয়ার কামিজ পরিহিতা সুন্দরী স্ত্রীকে বিভিন্নভাবে নির্যাতন করছে। ছেলেটি তার স্ত্রীকে বাঁচানোর ব্যর্থ প্রয়াস চালাচ্ছে। আমার স্ত্রীকে ছেড়ে দাও, বলে যখন সে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে তখন উচ্ছৃঙ্খল যুবকের দল আরও জোরে মেরে মেরে তাকে কুঁজো করে ফেলছে।

এ ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে কিছু বুঝে ওঠার আগেই সন্ত্রাসীদের নজরে পড়ে যায় তিয়া ও আলী। সেই সাথে যেনো একযোগে বারোটি হাত বারোটি পিস্তল তাক করে ধরে ওদের দিকে। হুংকার ছেড়ে 'এক পা আগাবেন না, চিৎকার করবেন না' বলতে বলতে ওদের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে।

www.pathagar.com

এ অবস্থায় তিয়ার তো মূর্ছা যাবার উপক্রম। হাত থেকে ব্যাগটি ধপ করে পড়ে যায় মাটিতে। দুজনে মৃত্যুর ভয়ে যেনো নীল হয়ে যাচ্ছে। মনে মনে আল্লাহকে ডাকতে থাকে ওরা। বিপদের সময় তিয়া সাধারণত 'লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতি ইল্লাহবিল্লাহ' পড়ে থাকে। আজও তা দ্রুত আওড়াতে লাগলো। তাই যেনো একটু হিম্মত ফিরে পেলো। সন্ত্রাসীরা যখন কাছে এসে অর্নামেন্টস চাচ্ছিলো, তখন তিয়া ভয় চেপে স্পষ্ট করে বললো, 'ভাই দয়া করে আপনারা গায়ে হাত দিবেন না। আমার কাছে শুধু এই ঘড়িটি আছে। আমার গায়ে কোনো গয়না নেই। বিশ্বাস করুন। আমি কখনও মিথ্যা কথা বলি না। আপনারা এই ঘড়িটি নিতে পারেন।' বলে ঘড়িটি খুলে এগিয়ে ধরে। কিন্তু ঘড়িটি পুরোনো বলে ওরা সেটা নেয়া থেকে বিরত থাকে।

সন্ত্রাসীরা ওর কান দেখতে চাইলে তিয়া স্কার্ফের ফাঁক দিয়ে একটু কান বের করে দেখালো, কানে কিছু নেই। এবার তারা আলীর কাছে যা আছে দিতে বললো। আলীর কাছে এক হাজার টাকা ছিলো সে তা বের করে দিলো। তার হাতের মূল্যবান নতুন ঘড়িটি দিতে গিয়েও একটু আমতা করে বললো, 'ভাই এই ঘড়িটি না নিলে কি হয় না? এটা আমার শ্বশুর আমাকে দিয়েছেন'।
কেনো জানি ওদের একটু মায়া হলো। ওদের একজন বললো, ঠিক আছে থাক।

তিয়া তখন বললো, ভাই, এখন আমরা বাসায় যাবো কীভাবে? আমাদের তো কোনো টাকা নেই।
এতে সন্ত্রাসীদের একজন একটি একশত টাকার নোট আলীর হাতে দিয়ে বললো, ভাইয়া, সোজা চলে যান। কাউকে জানানোর চেষ্টা করবেন না। তাহলে জানে মেরে ফেলবো।

নির্বাক হয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে তিয়া। ও যেনো নড়তে ভুলে গেছে। হঠাৎ আলী তার হাত ধরে টেনে রওনা হতেই ও যেনো সম্বিত ফিরে পেলো। চলতে গিয়ে পায়ের কাছে পড়ে থাকা ব্যাগটির দিকে দৃষ্টি পড়লো। যাতে ছিলো তিয়ার কলিগদের দেয়া কয়েকটি অর্নামেন্টস ও কিছু মূল্যবান উপহার। যা তারা আজই তিয়াকে অফিসে দিয়েছে। ওর কলিগদের সাথে ওর খুব মধুর সম্পর্ক। তাই যারা ব্যস্ততার জন্য তিয়ার বিয়েতে যেতে পারেনি তারা সবাই তাকে তাদের হৃদয়ের ভালোবাসার ছোট্ট টোকেন এই গিফ্টগুলো ওকে দিয়েছে। এই গিফ্টগুলোর কথা ভেবে তিয়া যেনো হঠাৎ আঁৎকে ওঠে। কী করে আল্লাহপাক

www.pathagar.com

এগুলো বাঁচিয়ে দিলেন সন্ত্রাসীদের হাত থেকে। নিজে নিজেই যেনো উত্তর খুঁজে পায় মনের ভিতর।

এসব গিফ্‌ট আমার কলিগদের কষ্টার্জিত হালাল টাকায় কেনা। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাই এগুলো হেফাজত করেছেন। কিন্তু একটি জিনিস তিয়াকে খুব ভাবিয়ে তুলেছে। সন্ত্রাসীরা কেনো তাদের সাথে সমীহ করে কথা বললো। কী অপরাধ ছিলো ঐ মেয়েটির? মেয়েটি ছিলো সুন্দরী এবং তার পরনে ছিলো অশালীন পোশাক যা তাদের অপকর্মের ইন্ধন যোগাতে ক্যাটালিস্টের মতোই কাজ করেছে। অপরপক্ষে তিয়ার সুন্দর মুখাবয়ব ছিলো পর্দায় আবৃত যা তাকে সন্ত্রাসীদের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রেখেছিলো। এই বেশ-ভূষার কারণেই হয়তো আল্লাহপাক তাদের রক্ষা করেছেন।

মহান আল্লাহ আজ যে তাদের কতো বড় বিপদ থেকে বাঁচালেন সে কথা ভেবে তিয়ার চোখ দু'টো ঝাপসা হয়ে এলো। নিকটবর্তী মসজিদে গিয়ে দু'রাকাত নফল নামাজ পড়ে ওরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলো। এ ভয়ঙ্কর ঘটনা বাসার বড়দের না বলার সিদ্ধান্ত নিলো। কারণ আব্বা-আম্মার এমনিতেই অনেক দুশ্চিন্তা তাদের নিয়ে। একমাস পূর্তি উপলক্ষে যে মধুর স্মৃতি তারা ধরে রাখতে চেয়েছিলো তা যেনো এখন শুধুই দুঃস্বপ্ন!

www.pathagar.com

ফিরে আসা

হঠাৎ করে রিনার ভেতরে এমন পরিবর্তন তামান্নাকে খুব ভাবিয়ে তুলেছে। কী এমন কারণ হতে পারে? কেনো সে পাশ কাটিয়ে চলছে ভেবে পায় না তামান্না। অনেকভাবে যোগ-বিয়োগ করেও যেনো মিলাতে পারছে না। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া অনেক ঘটনাকে সে পর্যালোচনা করে দেখছে কিন্তু কোনো ঘটনা বা ব্যবহারে রিনা আঘাত পেয়েছে কিনা বুঝতে পারছে না। তামান্না মায়ের অসুস্থতার জন্য বেশ কিছুদিন বাসায় থেকে ক্লাস করেছে। হোস্টেলে ফেরার পর থেকেই সে রিনার মধ্যে এই পরিবর্তন লক্ষ্য করছে। রিনা তার ঘনিষ্ঠ বান্ধবীদের একজন। স্মৃতির ক্যানভাসে রিনার সাথে ওর প্রথম পরিচয়ের দিনটি আজ বারবার ভেসে উঠছে।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে ভাইয়া যখন তামান্নাকে ইডেন কলেজের হোস্টেল গেটে নামিয়ে দিয়ে যায় তখন মনের অজান্তেই দুচোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছিলো। অনেক কষ্ট করেও সে কান্না রোধ করতে পারছিলো না। বুকের ভেতরে যেনো শুধুই শূন্যতা। বিশাল এ ক্যাম্পাসে নেই কোনো চেনামুখ। জীবনের প্রথম সে তার চিরচেনা পরিমণ্ডল থেকে অচেনা এক জগতে পদার্পণ করছে। উত্তরার একটি কলেজ থেকে এইচ.এসসি পাস করার পর সে ভর্তি হয়েছে ইডেন কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে। এতোদিন তো সে খুব আনন্দেই কাটিয়েছে বাবা-মা, ভাই ও ছোট বোন তারিনের সাথে। বাসা থেকে কলেজ দূরে বলে প্রথমবারের মতো সে হোস্টেলে এসেছে। কিন্তু এতোটা খারাপ লাগবে তা সে ভাবতেও পারেনি। রাতের অন্ধকার নেমে আসার সাথে সাথে তার মনও যেনো নিঃসঙ্গতায় হাঁপিয়ে উঠছিলো।

www.pathagar.com

সেদিন ছিলো দীর্ঘ ছুটির পর প্রথম কলেজ খোলার দিন। তাই হোস্টেলের রুমগুলো বেশির ভাগই ছিলো ফাঁকা। তামান্নার রুমের অন্য সিটগুলোও ছিলো খালি। দু'তলার এ রুমটির পূর্বপাশের জানালার পাশে পেয়ারাগাছের বেশ কয়েকটি ছড়ানো শাখা আবছা অন্ধকারে ভূতুরে লাগছিলো। দক্ষিণের জানালা বরাবর খাটটিতে বিছানা পেতে তামান্না প্রথমবারের মতো বসলো। বাগানের লাইটপোস্টের আলোতে সে দেখতে পেলো মাঝারি আকৃতির কদবেল গাছের ছোট ছোট পাতাগুলো কেমন হালকা বাতাসে দোল খাচ্ছে। হঠাৎ দরজার কড়া নাড়ার শব্দে তামান্না উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেয়। দরজায় দাঁড়িয়ে লম্বা ছিমছাম চেহারার সুন্দর একটি মেয়ে। গায়ের রঙ হলুদ ফর্সা, চোখ দুটো ডাগর ডাগর। এক নজরে মেয়েটি খুব সুন্দর। তামান্না মৃদু হেসে অভ্যর্থনা জানায়। মেয়েটি রুমে ঢুকতে ঢুকতে নিজের পরিচয় দেয়।

– আমার নাম রিনা। পাশের রুমে উঠেছি। অর্থনীতি প্রথম বর্ষ। আমি আজ সকালে প্রথম হোস্টেলে এসেছি। এ রুমে আলো দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে এলাম।

তামান্নাও নিজের পরিচয় দেয়,

– আমি একটু আগেই এসেছি। রুমে কেউ নেই বলে আমার খুব একা একা লাগছে।

– তামান্না তুমি কিছু ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। প্রথম প্রথম একটু খারাপ লাগবে, তারপর তোমার বাড়ি যেতেই ইচ্ছে হবে না। আমি যখন প্রথম ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময় হোস্টেলে ছিলাম, কয়েকদিন বেশ খারাপ লেগেছিলো। তারপর ফ্রেন্ডসার্কেল পেয়ে সব ভুলে গেলাম। তোমারও তাই হবে দেখো।

রিনার রুমেও সেদিন সে ছিল একা, তাই সে তামান্নার রুমে এসে ঘুমালো। এরপর থেকেই তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা। এক সাথে খেতে যায়, ক্লাসে যায়, এক সাথে নামাজের রুমে নামাজ পড়তে যায়। সময় পেলেই রিনা চলে আসে তামান্নার রুমে। এক সাথে বিকেলে মাঠে ঘুরে বেড়ায়।

রিনা নিম্নমধ্যবিত্ত রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে। সে পারিবারিকভাবেই হিজাব মেনে চলে। সাত সদস্যের পরিবারে তাকে একটু কষ্ট করেই চলতে হয়। অপরপক্ষে স্বচ্ছল পরিবারের আদরের বড় মেয়ে তামান্না স্কুললাইফ থেকেই পর্দানশীল বান্ধবীদের সংস্পর্শে থেকে পূর্ণ হিজাব পরা শুরু করেছে। রিনার সাথে ঘনিষ্ঠতার এটাও একটি অন্যতম কারণ।

www.pathagar.com

কিন্তু এতো ঘনিষ্ঠ বান্ধবী কীভাবে এতোটা পাল্টে গেলো বুঝে আসে না তামান্নার। এখন সে কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। গতকাল সে লক্ষ্য করেছে রিনা বেশ সাজগোজ করে পাশের ব্লকের শীলার সাথে বাইরে যাচ্ছে। কিন্তু যখন সে রিনাকে শালীনতা বিবর্জিতভাবে বাইরে যেতে দেখলো তখন আর নিজেকে সামলাতে পারছিলো না। অনুশোচনায় তার ভেতরটা যেনো জ্বলে যাচ্ছিলো। 'এ বুঝি আমারই ভুলের রেজাল্ট। কেনো আমি আরও আগে ওকে বুঝতে চেষ্টা করিনি? কেনো আরও বেশি করে ওকে সঙ্গ দেইনি? ও যদি এভাবে হারিয়ে যায় আমি কী জবাব দেবো আল্লাহর কাছে?' অস্থির হয়ে ভাবছে তামান্না।

শীলা খুব চতুর মেয়ে। স্কুলজীবন থেকেই সে বাবলু নামে একটি ছেলেকে ভালোবাসে। সপ্তাহে দু'তিন দিন সে বাবলুর সাথে বাইরে ঘুরতে যায়। বাবলুর দেয়া বিভিন্ন গিফ্‌ট সে প্রায়ই বান্ধবীদের দেখায়। মাঝে মাঝেই ক্লাস মিস করে সে চলে যায় পার্কে অথবা চাইনিজে। পড়ালেখার সাথে ওর কমই সম্পর্ক। পরীক্ষা এলে চিন্তা কী? নকলবাজিতেও তো আর সে কম এক্সপার্ট নয়? তাই কোনো রকমে উৎরে যায়। রিনা ওর ফাঁদে কী করে যে পা দিলো বুঝে পায় না তামান্না।

গতকাল রিনাকে অশালীন পোশাকে দেখার পর থেকে তামান্নার ভেতরে ঝড় বইছে। কোনো কাজে মন বসাতে পারছে না। সিদ্ধান্ত নিলো রিনাকে একান্তে ডেকে কিছু কথা বলবে। তাই সকালে নাশতা সেরে রিনার রুমে গেলো। গিয়ে দেখে রিনা রুমে নেই। একটু অগ্রসর হয়ে শীলার রুমে উঁকি দিতে দেখতে পেলো, রিনা ও শীলা খাটে শুয়ে শুয়ে গল্প করছে। তামান্না রিনাকে একটু বাইরে আসতে ডাকলো। কিন্তু রিনা 'জরুরি কথা বলছি' বলে যেমন শুয়ে ছিলো তেমনি থাকলো। তামান্নার বুঝতে একটুও বাকি রইলো না যে, রিনা তাকে এভয়েড করার জন্য জরুরি কথার অজুহাত দিচ্ছে।

বিকেলে আসরের নামাজ শেষে তামান্না আল্লাহর সাহায্য চেয়ে দোয়া করলো। তারপর আবারও এটেম্‌ট নিলো রিনার সাথে কথা বলার। রিনা রুমেই ছিলো, 'চলো রিনা বাগানে হাঁটতে যাই' তামান্নার প্রস্তাবে রিনা প্রথমটায় কিছুটা ইতস্তত করলো। তারপর রুম থেকে বের হয়ে আসলো। ওরা হেঁটে হেঁটে পূর্ব দিকের বাগানের শিউলিতলায় সুন্দর ঘাস দেখে বসে পড়লো। তামান্না বিভিন্ন কথা জিজ্ঞেস করছে কিন্তু রিনা খুব সংক্ষেপে হ্যাঁ না বলে জবাব দিচ্ছে। এক সময় তামান্না প্রশ্ন করলো,

www.pathagar.com

– বলতো রিনা তোমার কী হয়েছে? আজকাল কেনো আমাকে এমন পাশ কাটিয়ে চলছো?
– কিছু না, এমনি।
– তবে তুমি এতোটা বদলে গেলে কীভাবে? যে শীলাকে তুমি পছন্দ করতে না আজ তার সাথে তোমার কিসের এতো মেলামেশা? ওতো একটি সুচতুর মেয়ে। ওর খপ্পরে পড়ে তো তুমি তোমার স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলেছো। তুমি কি খালাম্মা-খালুর কথা একদম ভুলে গেলে? তোমাকে কি তাঁরা এ জন্য হোস্টেলে পাঠিয়েছেন? বলো, কোন জিনিস তোমাকে তোমার হিজাব ছাড়িয়েছে?

উত্তেজনায় কাঁপছে তামান্না আর ওর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছে। ওর কান্নায় রিনা কী করবে বুঝতে পারে না। আমতা আমতা করে বলতে থাকে,
– কিন্তু... কিন্তু... আ-মি কী করবো? আমি তো একটি অসহায় ছেলেকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করছি।
– তার মানে? কী বলছো তুমি? কে সেই ছেলে? কীভাবে তোমার সাথে পরিচয় হলো?
– আমি তো কিছু বলতে পারছি না। শিলা আমাকে বলতে নিষেধ করেছে।
– সর্বনাশ করে ফেলেছো, তাড়াতাড়ি খুলে বলো সব ঘটনা।
রিনা এবার বলতে থাকলো,
– শীলা আমাকে একদিন ডেকে বললো, রিনা তোমাকে আমার খুব ভালো লাগে। তুমি খুব সরল প্রকৃতির মেয়ে। তোমার ভেতর অনেক সুন্দর সুন্দর গুণ আছে। বোন, তুমি কি একটি উপকার করতে পারো? আমি জানি একমাত্র তুমিই পারবে শামীমকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে।
শামীম সম্পর্কে আমি জানতে চাইলে ও বললো, 'শামীম একজন মেধাবী ছাত্র। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যানেজমেন্টে মাস্টার্স পাস করেছে। দেখতেও খুব সুন্দর। চট্টগ্রামের এক বড় ব্যবসায়ীর একমাত্র পুত্র। ও শেহরীন নামে একটি সুন্দরী মেয়েকে খুব ভালোবাসতো। কিন্তু ওর সে সুখ আর কপালে সইলো না। এই তো সেদিন শেহরীন সাপের কামড়ে মারা গেছে। তাই শামীম এখন পাগল প্রায়। নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে শেহরীনের কবরের পাশে বসে কান্নাকাটি করে। ওকে বাঁচাতে হলে তোমার মতো একটি মেয়ে দরকার। তাছাড়া তোমার সাথে ওকে খুব মানাবে।
তামান্না যেনো সাগ্রহে গিলছে।
– তারপর।

www.pathagar.com

– তারপর শীলা আমাকে একদিন নিয়ে গেলো রমনায় ওর সাথে দেখা করার জন্য। শীলার কাছে সব শুনে শামীমের জন্য আমার মায়া হয়ে গেলো। তাই আমি ওকে বাঁচানো চেষ্টা করতে লাগলাম। এরপর থেকে প্রায়ই ওর সাথে দেখা করার জন্য শীলা আমাকে নিয়ে যায়।

– হায় আল্লাহ! তুমি কী জানো না শীলা একজন প্রতারক! ওতো অনেক মেয়েকে এভাবে প্রেমের ফাঁদে আটকে দিয়েছে। তুমি কি ওর কথা বিশ্বাস করছো? ওসব ঘটনার সবই মিথ্যা। নওরীনকেও সে এ ধরনের কথা বলেছিলো। শীলার খুব কনভিনসিং পাওয়ার আছে। ও সুন্দর ভাষা দিয়ে মিথ্যাকে সত্য বানাতে পারে। ভালো ভালো মেয়েদেরকে বখাটে ছেলেদের সাথে মিলিয়ে দিয়ে টু পাইস কামায়।

– উহ, আমি তাহলে কী করবো? শীলা তো পার্কে শামীমের সাথে আমার অনেক ছবিও তুলেছে। শীলা আমাকে শেহরীনের মতো করে শাড়ি পরা শিখিয়ে দিয়েছে। ও বলেছে সুন্দর করে এভাবে শাড়ি পরো, তাহলে তোমাকে শেহরীনের মতো দেখাবে। তুমি তো একটি মহৎ কাজ করতে যাচ্ছ তাই আপাতত বোরকা না পরলে গোনাহ হবে না।

তামান্না অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করলো,

– তুমি এতো বোকা কী করে হলে রিনা? তুমি কি জানো না রাসুলের (সা.) সতর্ক বাণী, ' তোমরা দেখে-শুনে বন্ধু নির্বাচন করবে, কারণ মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে।'

তিনি আরো বলেছেন, 'দুনিয়াতে তোমরা যাদের সাথে ওঠাবসা করবে তাদের সাথেই তোমাদের হাশর হবে। তাই আজ তুমি একজন প্রতারকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে প্রতারণার শিকার হয়েছো। আল্লাহর পথ থেকে যে তোমাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে নিশ্চিত ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে।'

তামান্নাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কেঁদে ওঠে রিনা।

– তামান্না প্লিজ আমাকে বাঁচাও।

– আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও বোন। আপাতত একটি কাজ করো। এখন ক্লাসের তো খুব একটা চাপ নেই, তাছাড়া দশ-বারো দিন পর তো সামার ভেকেশান হবে, তুমি কিছুদিনের জন্য বাড়ি চলে যাও। এদিকটা আমি মেনেজ করার চেষ্টা করছি।

রাতের বেলা চুপি চুপি রিনা জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখলো। সকালের নাস্তার পর সে বেরিয়ে পড়লো গাবতলী বাসস্ট্যান্ডের উদ্দেশ্যে।

www.pathagar.com

অনুপ্রেরণা

শেরপুর সরকারি স্কুলের দশমশ্রেণীর ছাত্র মুসাব্বিরের ছোটবেলা থেকেই ঢাকায় থেকে পড়াশুনা করার খুব শখ। কিন্তু আট ভাইবোনের বড় সংসারে স্কুল শিক্ষক বাবার পক্ষে মফস্বল শহরে থেকে সবার লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়াই ছিলো খুব কষ্টকর। ঢাকায় ছেলেকে পড়ানো কথা সে তো কল্পনাও করতে পারে না। বড়ছেলে শহিদের বি.এ পাস করার পর বাবাকে সাহায্য করার জন্য চাকরি নিতে হলো। শহিদ ঢাকার একটি ফার্মে ছোটখাটো একটি চাকরি যোগাড় করে নিলো। যা স্বল্প বেতন সে পায় তা দিয়ে নিজের লেখাপড়ার খরচ চালানোর পাশাপাশি ছোট ভাইবোনদের একটু সাহায্য করতে চেষ্টা করে। এতে করে বাবা আবদুর রহিম সাহেব যেনো একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

শহিদ মুসাব্বিরকে খুব ভালোবাসে। ছোটভাইকে সে আদর করে বললো, ভাইয়া, তুমি যদি এস.এস.সি তে ভালো রেজাল্ট করতে পারো তবে আমি তোমাকে আমার কাছে রেখে লেখাপড়া করাবো।

এ কথা শুনে মুসাব্বির তো মহাখুশি। তাই সে রাতদিন খেটে লেখাপড়া করতে লাগলো। সে জানে, প্রাইভেট টিউটর দেবার সামর্থ্য তার বাবার নেই। তাই ক্লাশে সে খুব মনোযোগী হয়ে উঠলো। ওর টার্গেট, ও ক্লাশ থেকেই সবকিছু বুঝে যাবে। সাব্বির এতোদিন যাদের সাথে মিশতো স্বভাবতই সবাই ছিলো ছাত্র হিসেবে খারাপ। তারা তাকে বিভিন্নভাবে টিটকারি দিয়ে কথা বলতে লাগলো। তাই সে বন্ধুদের সাথে বসলে বেশির ভাগই চুপ করে থাকে। একদিন ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু মেহেদী তো বলেই বসলো,

www.pathagar.com

– কিরে? নিজেকে এতো গুটিয়ে নিয়েছিস কেনো? প্রেমে পড়েছিস নাকি?
জবাবে মুসাব্বির শুধু হাসে। কারণ ওদের এসব বাজে কথার জবাব দিলে কথা শুধু বেড়েই যাবে। তার চেয়ে চুপ থাকাই শ্রেয়।
দিন দিন মুসাব্বিরের রেজাল্ট ভালো হতে লাগলো। ওর এ অবস্থাটি শিক্ষকদের দৃষ্টিতে এলো। একদিন বিজ্ঞান শিক্ষক নূরুন্নবী সাহেব ওকে ডাকলেন।
– মুসাব্বির, টিফিনের সময় তুমি একটু আমার কাছে এসো।
মুসাব্বির চিন্তিত হয়ে পড়লো। স্যার আমাকে কেনো ডাকলেন, কোনো অন্যায় হলো নাতো?
ভীরু ভীরু মন নিয়ে সে শিক্ষকদের কমনরুমে ঢুকলো। নূরুন্নবী সাহেব মুসাব্বিরকে দেখে হেসে দিয়ে বললেন,
– মুসাব্বির কিছুদিন যাবৎ আমি লক্ষ্য করছি তুমি লেখাপড়ায় বেশ মনোযোগী হয়ে উঠেছো। সব শিক্ষক তোমার এ পরিবর্তনে বেশ খুশি। তোমার যেটুকু সমস্যা আছে একটু সাহায্য পেলেই তুমি কাটিয়ে উঠতে পারবে। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি ক্লাশের সময়ের বাইরে তোমাকে সাহায্য করার। যে সব বিষয় তোমার কাছে কঠিন লাগে সেগুলোর জন্য তোমাকে স্পেশাল কোচিং দেবো। কিন্তু তাই বলে ভেবো না সে জন্য তোমাকে কোনো ফি দিতে হবে।
মুসাব্বির খুশিতে কেঁদে ফেলে বললো,

– স্যার আপনার এ ঋণ আমি কোনোদিন শোধ করতে পারবো না।
– দেখো বাবা, তুমি একজন শিক্ষকের ছেলে। তাছাড়া তুমি নিজেই যখন ভালো হওয়ার চেষ্টা করছো সেক্ষেত্রে তোমাকে সাহায্য করা আমাদের কর্তব্য। ঠিক আছে তাহলে, আগামীকাল থেকে স্কুল ছুটির পর একঘন্টা করে আমি তোমাকে বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্য করবো।

পরদিন থেকে সে নিয়মিত স্যারের কাছে পড়ছে। নূরন্নবী স্যার বিজ্ঞানের শিক্ষক বলে তিনি অঙ্ক এবং বিজ্ঞানের সব বিষয়ে অভিজ্ঞ। ইংরেজিতেও তাঁর দক্ষতা আছে। তাই কঠিন বিষয়গুলো নিয়ে আর ওর কোনো চিন্তা রইলো না।

আস্তে আস্তে স্যারের সাথে মুসাব্বিরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠলো। যে স্যারকে আগে খুব ভয় পেতো এখন তাঁকে খুব আপন মনে হয়। ইচ্ছে হয় স্যারকে অনেক কিছু গিফ্‌ট দিতে। কিন্তু বাধ সাধে তার সামর্থ্য। তাই ওর বাগানের নিজ হাতে বোনা গোলাপের গাছ থেকে সদ্যফোটা লালগোলাপ নিয়ে সযতনে তুলে দেয় স্যারের হাতে।

www.pathagar.com

– বেঁচে থাকো বাবা। খুশি হয়ে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দেন নূরুন্নবী সাহেব।

সেবার ঈদের ছুটির আগের রাতে রাত জেগে বসে বসে ঈদকার্ড বানালো মুসাব্বির। পুরোনো টুথব্রাসে বিভিন্ন রকম কালি লাগিয়ে ছিটিয়ে ছিটিয়ে তৈরি করলো সুন্দর একটি ঈদকার্ড। যা সে পরের দিন একটি খামে ভরে স্যারকে দিলো। স্যার ওর হাতে তৈরি ঈদকার্ড পেয়ে ভীষণ খুশি হলেন। তিনি মুসাব্বিরের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন,

– বাবা মুসাব্বির, আমি খুব খুশি হয়েছি যে তুমি এখন আমার ক্লাশ বেশ উপভোগ করছো। তোমাকে নিয়ে আমি খুব আশাবাদী।
একটু থেমে তিনি আবার বললেন,

– কিন্তু জানো? শুধুমাত্র ভালো নম্বর তোমাকে একজন ভালো ছাত্রে পরিণত করতে পারবে না, যতোক্ষণ না তুমি একজন ভালো মানুষ হবে। আর এ ভালো মানুষ হওয়ার জন্য তোমাকে অবশ্যই একজন ভালো বান্দা হতে হবে, যা তোমাকে মার্জিত ও পরিশীলিত করবে।
– স্যার, দয়া করে বলবেন কি, ভালো বান্দা হওয়ার জন্য আমাকে কী করতে হবে?
– ভালো বান্দা হতে প্রথমে তোমাকে তোমার স্রষ্টাকে চিনতে হবে এবং যে সব কাজ তিনি পছন্দ করেন শুধু সেগুলো করতে হবে, যা তিনি পছন্দ করেন না তা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।
– স্যার, আমি তো এখন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার চেষ্টা করি।
– তা তো খুবই ভালো কথা। তোমাকে আরও চেষ্টা করতে হবে গভীর জ্ঞানের উৎস আল কুরআনকে ভালো করে জানার। তবেই তুমি নিজেকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারবে।

পড়ার ফাঁকে ফাঁকে এভাবে মুসাব্বিরের অনেক কথা হয় স্যারের সাথে। তাই খুব সুন্দর পরিবেশে খোলা মন নিয়ে চলতে থাকে মুসাব্বিরের পড়াশুনা। তখন এসএসসি পরীক্ষার মাত্র দুইমাস বাকি। একদিন মুসাব্বিরের বন্ধু মেহদী, রায়হান ও সাকিব ওকে নূরুন্নবী স্যারের কাছে পড়তে দেখলো। পরের দিন ওরা মুসাব্বিরকে জিজ্ঞেস করলো,

– মুসাব্বির, গতকাল দেখলাম তুই নূরন্নবী স্যারের কাছে পড়ছিস। তা তোর ভালো রেজাল্ট করার পিছনে এটাই বুঝি কারণ?

www.pathagar.com

– তোরা ঠিকই বলেছিস, স্যার অত্যন্ত ভালো মানুষ। তোদের তো লেখাপড়ার প্রতি কোনো আগ্রহ দেখি না। তা না হলে তো তোরাও স্যারের কাছে পড়তে পারতি।

মেহদী বেশ অনুশোচনার সুরে বললো,

– আসলে আমরা খুব ভুল করছি রে! পরীক্ষা তো একদম কাছে। এখন কী করবো?

– চল্ না, যে কয়টা দিন আছে আমরাও চেষ্টা করে দেখি। প্রস্তাব করলো রায়হান।

সাকিবও বেশ নরম সুরে বললো,

– হ্যাঁ রে, আমিও যদি লেখাপড়ায় মনোযোগ দিতাম তবে আমার আব্বা-আম্মা যে কতো খুশি হতেন।

– তাহলে আর দেরি নয়। তোদের ব্যাপারে আজই আমি স্যারের সাথে কথা বলবো।

নূরুন্নবী স্যারও সবাইকে দেখে খুব খুশি হলেন এবং যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলেন এই হারিয়ে যাওয়া ছেলেগুলোকে ফিরিয়ে আনার জন্য।

যথাসময়ে পরীক্ষা হলো। রেজাল্টও বের হলো। এবারের রেজাল্ট স্কুলে বেশ সাড়া ফেলে দিলো, কারণ যে সব ছেলে ক্লাশে সবচেয়ে অমনোযোগী ছিলো তারা এবার সবাই ভালো রেজাল্ট করেছে। তবে মুসাব্বিরের রেজাল্ট শুনে সবাই অবাক হয়ে গেলো। সে এ-প্লাস পেয়ে পাস করায় নূরুন্নবী স্যার এতো খুশি হলেন যে, তিনি ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু দিতে লাগলেন। নূরুন্নবী স্যারের এ অবদানে স্কুল কর্তৃপক্ষসহ অভিভাবকরাও অনেক} খুশি হলেন।

রেজাল্টের খবর পেয়ে শহিদ বাড়ি আসলো। রাস্তার ধারে মুসাব্বিরদের বাড়ির কাছে যখন বাস থামলো খুশিতে আত্মহারা হয়ে মুসাব্বির দৌড় দিলো ভাইয়াকে রিসিভ করার জন্য।

www.pathagar.com

সাগরকন্যার ভালোবাসা

ছোটবেলা থেকেই আমি কক্সবাজারের সমুদসৈকতের আকর্ষণ তীব্রভাবে অনুভব করি। বড় হওয়ার সাথে সাথে সে আকর্ষণ যেনো প্রবল থেকে প্রবলতর হতে থাকে। অনেকবার সাগরসৈকতে বেড়ানোর সুযোগ হওয়া সত্ত্বেও বারবার মনে হয় আবার কবে যাওয়া হবে? এ যেনো সেই প্রিয়জন, যাকে বারবার দেখেও মন ভরে না। পাহাড়ের প্রতিও আমার অনেক টান। কিন্তু সে টান সাগরের তুলনায় একটু কম। যুগে যুগে নবী-রাসুল ও আল্লাহ প্রেমিকদের পাহাড়ের সাথে ছিলো গভীর সখ্য। তাঁরা দিনের পর দিন কাটিয়েছেন আল্লাহকে পাওয়ার উদগ্র বাসনা নিয়ে এই পাহাড়ের গুহায়। মাঝে মাঝে আমারও সবুজ পাহাড়ের গায়ে গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকার তৃপ্তি হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে ইচ্ছে হয়।

সাব্বিরের সাথে বিয়ের পর থেকে বেশ কয়েকবার যাওয়া হয়েছে কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানী যে, সাব্বিরও সাগরসৈকত খুব পছন্দ করে। এই তো সেদিনও দুজনে কর্মস্থলের ছুটি মেনেজ করে চলে গেলাম। হোক না অফ সিজন তাতে কী? অফ সিজনের একটি মজাও আছে। সাগরপাড়ে মানুষের ভিড় কম থাকে। হোটেল-মোটেলগুলোও খালি পাওয়া যায় সহজেই। মোটেলের ভাড়াও থাকে অর্ধেক। উঠলাম সাগরের কাছাকাছি মোটেল প্রবালে, তৃতীয় তলার একটি রুমে। রুমটি বেশ বড়, দুই বেড। সংলগ্ন বড় একটি বারান্দা, যেখান থেকে খুব সুন্দরভাবে সাগর দেখা যায়। এমনকি সাগরের জোয়ার-ভাটার সিগন্যাল ফ্লাগটিও দেখা যায়। দুপুরে নাওয়া-খাওয়া শেষ করে অল্প কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম। তারপর ঝটপট রেডি হয়ে চলে গেলাম সাগরপাড়ে। হেঁটে যেতে পাঁচ-ছয় মিনিট লাগলো। হাঁটতে হাঁটতে সাব্বির তৃপ্তির সাথে বলছিল,

www.pathagar.com

– 'রিমি, অবশেষে আল্লাহর মেহেরবানীতে ছুটি মেনেজ হলো, নইলে কী যে কষ্ট হতো। প্রতি বছর অন্তত একবার সাগরসৈকতে না আসতে পারলে যেনো মনটাই মরে যায়। তোমার কথা ভেবে আরও কষ্ট হচ্ছিলো।'
আমারও ছিলো একই অনুভূতি। শীতের সময় অনেক চেষ্টা করেও যখন সময় বের করা গেলো না তখন বেশ একটু নিরাশ হয়েছিলাম। তাই ভাবলাম,
শীতের শান্ত সাগর দেখতে বেশ সুন্দর কিন্তু বর্ষার রুদ্ররূপ কম সুন্দর নয়। এ এক আলাদা ব্যাপার।

গল্প করতে করতে এগুচ্ছিলাম আর দেখছিলাম চারদিকের প্রকৃতি। সাগরপাড়ে কয়েক বছর আগে লাগানো ঝাউগাছগুলো এখন অনেক বড় হয়েছে। নতুন নতুন অনেক বড় মোটেলও হয়েছে। গড়ে উঠেছে সি-ফুডের দোকান। দেখতে দেখতে চলে গেলাম বেলাভূমিতে। সাগরের দিকে তাকালে মনে হয়, পৃথিবীতে বুঝি পানি ছাড়া আর কিছু নেই।

দোকানীরা সৈকতের বিভিন্ন স্থানে তাদের পসরা সাজিয়ে বসে আছে। শামুক, ঝিনুক, মুক্তার তৈরি জিনিসপত্র ছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন রকম গহনাপত্র। রয়েছে বিভিন্ন ফাস্টফুড বিক্রেতা, চটপটি, ঝালমুড়ি, বাদাম, আমড়া, ডাব, আইসক্রিম আরও কতো কী? সাগরের বিশুদ্ধ বাতাসে হেসে-খেলে বেড়িয়ে ক্ষুধার উদ্রেক হলে ক্ষতি কি? বালুকায় বসে গল্প করার ছলে কিছু খেয়ে নেয়া যায়। সন্ধ্যা নাগাদ বেশ কিছু খাবার কিনে খেলাম দুজন মিলে। প্রথমবার যখন এসেছিলাম পানিতে ভিজার একটু ইচ্ছে ছিলো। কিন্তু সাব্বির আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলো যে এতে পর্দার খেলাপ হয়। তারপর থেকে আমার আর সে ইচ্ছে জাগে না। তাই হাঁটছিলাম বালির উপর দিয়ে এদিক থেকে ওদিক। দেখলাম ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ছোট ছোট নেট দিয়ে চিংড়ির পোনা ধরছে। ডিম থেকে বের হওয়া চিংড়ি ও কাঁকড়া একই রকম দেখতে, কিন্তু ছেলেমেয়েরা সেগুলো সুকৌশলে শনাক্ত করছিলো। ঘুরতে ঘুরতে দেখলাম এক জায়গায় ছোট একটি ট্রলিতে করে একটি লোক আমড়া ও মিষ্টি পান বিক্রি করছে। আমি সাব্বিরকে বললাম,
– চলো না আমাকে একটি মিষ্টিপান কিনে দিবে।
সাব্বির পান খাওয়া একদম পছন্দ করে না। কিন্তু কোনো কোনো হ্যাপি মোমেন্টে সে আমাকে তা নিষেধ করে না। আমরা চলে গেলাম ট্রলিটির কাছে। দেখলাম লোকটির পাশে দাঁড়িয়ে আছে লাজুক প্রকৃতির ছোট একটি মেয়ে। সাব্বির মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলো,
– তোমার নাম কী?

www.pathagar.com

– রোজিনা
– তুমি কি লেখাপড়া করো?
– জি। আমি ক্লাশ সেভেনে পড়ি।
– তোমাদের বাড়ি কোথায়?
– সাতকানিয়া। আমি সাতকানিয়া স্কুলে পড়ি। উনি, আমার আব্বা। আমি আব্বার সাথে বেড়াতে এসেছি।

রোজিনা খুব যত্ন করে মিষ্টি পান-মসলা দিয়ে পান খিলিটি বানিয়ে দিলো। দাম এক টাকা। আমি আমার বোরখার পকেট থেকে একটাকা ওকে দিলাম। তারপর সাব্বিরও ওর পকেট থেকে একটাকা বের করে দিলো। বেশ একটু কৌতুক-ছলেই আমরা দুজন ওকে খুশি করতে চাইলাম। এভাবে আমি এক টাকা দেই তো সাব্বির দেয় আরও এক টাকা। আমরা ততোক্ষণ পর্যন্ত ওকে এক টাকা করে দিতে থাকলাম যতোক্ষণ আমাদের পকেটে এক টাকার নোট বা কয়েন ছিল। মেয়েটি ও তার বাবা হেসে হেসে বেশ উপভোগ করছিলো। তারপর মেয়েটিকে একটু আদর করে হাসতে হাসতে আমরা চলে এলাম।

পরের দিন সকাল সকাল আমরা মোটেল প্রবাল থেকে বেরিয়েছি। প্রাকৃতিক ঝর্না দেখার জন্য হিমছড়ি যাবো। কিছুক্ষণ বেলাভূমিতে বেড়িয়ে একটি জিপ ভাড়া করলাম। অফসিজন বলে দুইশ টাকায় যেতে রাজি হলো। রওনা হবার আগে একটু ফ্রেশ হয়ে নেয়ার জন্য গেলাম পাবলিক টয়লেটে। আমি যখন টিউবঅয়েলের পানিতে পা ধুচ্ছিলাম। হঠাৎ পিছন থেকে ছোট্ট একটি সম্বোধন,
- চাচি!
আমি ফিরে তাকালাম। দেখি মিষ্টি করে হাসছে রোজিনা। বললো, দূর থেকে আপনাদের দেখে এখানে এসেছি।
যখন আমরা জিপে গিয়ে উঠলাম, রোজিনা দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছিলো।

ছুটে চললো আমাদের জিপটি বালির উপর দিয়ে। কক্সবাজার থেকে তের কিলোমিটার দূরে হিমছড়ি। সড়কপথেও যাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের ইচ্ছে ছিলো সাগরের উপকূলের বালির উপর দিয়ে বিশেষ জিপগুলোতে যাবো। দীর্ঘ পথের পুরোটাই ডানে উত্তাল সাগর, বামে শান্তসৌম্য একটানা পাহাড়। মন থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসে, সুবহানাল্লাহ। তোমার সৃষ্টির কৌশল কতোই না সুন্দর। মনে হচ্ছিলো সাগরের সমস্ত মাটি দিয়ে যেনো আল্লাহপাক

www.pathagar.com

পাহাড়টি গড়েছেন। কী যে অপূর্ব দৃশ্য! সবুজে ঘেরা বিশাল পাহাড় যেনো সমুদ্রের হুংকার থেকে প্রাচীরের মতোই আড়াল করে রেখেছে নিকটবর্তী এলাকাগুলোকে। সাগরের ঢেউ এসে মাঝে মাঝেই জিপের মধ্যে আমাদের একটু ভিজিয়ে যাচ্ছিলো। চোরাবালির কথা ভেবে একটু ভয়ও লাগছিলো।

পৌঁছে গেলাম হিমছড়ি। সেখানে পাহাড়ের গা বেয়ে প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত পানি সৃষ্টি করেছে ছোট ছোট নালা। যা ক্রমান্বয়ে সাগরের সাথে এসে মিশেছে। এলাকার লোকদের কাছে জানতে পারলাম, এই পানির প্রবাহ শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সব ঋতুতেই সমান থাকে। কোথা থেকে আসছে এই পানি? পাহাড়ের কাছে গিয়ে দেখলাম, যেনো প্রতিটি বালিকণার ফাঁক থেকে ফোঁটা ফোঁটা করে পানি ঝরছে। একেই বুঝি বলে পাহাড়ের কান্না? এই ছোট ছোট বারি-বিন্দুগুলোই একত্রিত হয়ে সৃষ্টি করেছে শক্তিশালী ঝর্নার। স্বচ্ছ-সুন্দর পানির প্রস্রবণ। সব দেখে শুনে ফিরে এলাম একই পথ ধরে সাগর ও পাহাড়কে একত্রে উপভোগ করতে করতে।

বিকেলবেলা আসরের নামাজ শেষে আবার চললাম সাগরের ধারে। অস্তগামী সূর্যের রক্তিম আভা সাগরের পানিতে যে মায়াবী রূপের সৃষ্টি করে তা নয়ন ভরে উপভোগ করার জন্য। আগামী দিন রওনা হতে হবে ঢাকার উদ্দেশ্যে। এ সন্ধ্যায়ই আমাদের সাগরের কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে। তাই ঢাকার বন্ধুদের গিফট দেয়ার জন্য কিছু সাগরের উপহারসামগ্রীও সাথে নিতে হবে। সূর্য অস্ত যাওয়ার দৃশ্য দেখার জন্য একটু দূরে গিয়ে সুন্দর একটি স্থান বেছে নিয়ে বসে রইলাম। সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানে বসে বাদাম খেতে খেতে গল্প করলাম। আমরা যখন অস্তমিত সূর্যের দৃশ্য দেখায় ব্যস্ত ঠিক তখনই রোজিনা দৌড়াতে দৌড়াতে এসে হাজির। আমরা তাকাতেই ফিক করে হেসে দিলো। দেখি ও ডান হাতে ধরে রেখেছে দুই খিলি মিষ্টি পান। ঐ পানখিলি দুটি ছিলো ওর হৃদয়ের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম রোজিনার দিকে। কারণ সে অনেক দূরে বসা ওর আব্বার কাছ থেকে আমাদের খুঁজে খুঁজে এখানে এসেছে শুধুমাত্র আমাদেরকে দুটি পানখিলি উপহার দেয়ার জন্য।

সাব্বির আমাকে চুপ চুপ করে বললো,
– রিমি একটি খিলি নাও, কারণ ও খুব মায়া করে ওটি এনেছে।

www.pathagar.com

আর রোজিনাকে বললো,
– রোজিনা আমি তো পান খাই না। তোমার চাচিকে একটি দিয়ে আর একটি তুমি নিয়ে যাও।
ও খুব খুশি হয়ে একটি পান আমার হাতে দিয়ে বিজয়ের হাসি হাসতে হাসতে রওনা দিলো বাবার দিকে।

ওদিকে সূর্য তার বিদায় আয়োজন শেষ করার পথে। আমরাও উঠে দাঁড়ালাম মাগরিবের নামাজ আদায় করার জন্য।
সাব্বির বললো, চলো রিমি, আমরা রোজিনার বাবাকে বলে যাই আগামীকাল চলে যাচ্ছি।
সেখানে গিয়ে সাব্বির বললো,

– এই যে ভাই, আমরা আগামীকাল ঢাকায় রওনা হবো, তাই আপনার কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছি। আপনার মেয়েটি খুব ভালো। ওকে যতোটা সম্ভব লেখাপড়া করাবেন। আমার এই কার্ডটি আপনি রাখেন, প্রয়োজনে যোগাযোগ করবেন।
লোকটি বললো,

– ভাগ্যে ছিলো তাই আপনাদের সাথে দেখা হলো। এমনি কতো জন আসে এই সাগরের ধারে, জীবনে আর তাদের সাথে দেখা হয় না। আপনাদের সাথে পরিচিত হতে পেরে আমি খুব খুশি হয়েছি। আমার মেয়ে তো দুদিন ধরে শুধু আপনাদের কথা বলছে।

পাশে দাঁড়িয়ে ছিলো রোজিনা অবনত মস্তকে। আমাদের বিদায়ের কথায় ওর মুখটি হঠাৎ যেনো গম্ভীর হয়ে উঠলো। আমি ওর মাথায় হাত রাখতেই ওর দুগণ্ড বেয়ে ঝরতে লাগলো অশ্রুবিন্দু। ওর ছোট্টমনের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ সেই অশ্রুবিন্দুর মূল্য আমি কিভাবে দেবো জানি না। তবে এটুকু বলতে পারি উত্তপ্ত ঐ নোনাজল আমার মনের গহিনে ঠাঁই করে নিতে এতোটুকুও ভুল করেনি।

www.pathagar.com

আমি সেই মায়শা

কলিংবেলের শব্দ পাওয়ার সাথে সাথে খেলা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় মায়শা। কারণ এই ডবলক্লিক করা সাউন্ডটি ওর কাছে অতি পরিচিত, অতি প্রিয়। পাঁচ বছরের মায়শা দৌড়ে যায় গেটের দিকে। মাকে চিৎকার দিয়ে বলতে থাকে আম্মু নানুমণি এসেছেন।

বুদ্ধি হওয়ার সাথে সাথে নামুমণিকে ও খুব ভালোবাসতে শুরু করেছে। তার কারণও আছে। নানুমণিও তো ওকে খুব আদর করেন। কতো রকমের গল্প শুনান। ওর সব প্রশ্নের সুন্দর জবাব দেন। যখনই ওদের বাসায় আসেন হাতে করে নিয়ে আসেন রকমারি খাবার। সবকিছুর মধ্যে মায়শার সবচেয়ে প্রিয় হলো চিপসের প্যাকেটটি। নানুমণি বাসায় এলে মায়শা গুটিগুটি পায়ে নানুর কাছে যায়। এটা-ওটা প্রশ্ন করে। কাছ ঘেঁষে গিয়ে বসে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, সে কখনও নানুর কাছে চিপস এনেছেন কিনা তা জিজ্ঞেস করে না। পাশে বসে নানুমণির খোঁজ-খবর নেয় এবং অপেক্ষা করতে থাকে নানুর পাঞ্জাবির পকেটে চিপসের প্যাকেটের কচমচ শব্দের। গৃহপরিচারিকা গেট খুলে দিতেই মায়শা দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরে নানুকে।

– আসসালামু আলাইকুম নানুমণি। আপনি এসেছেন নানুভাই। খুশিতে টগবগ করে বলতে থাকে মায়শা।

– ওয়াআলাইকুমুস সালাম, ছোটআপু। হ্যাঁ, আমি এসেছি। তোমাকে কয়েকদিন না দেখলে যে আমার ভালো লাগে না আপু।

নানুমণি মায়শাকে এভাবেই ছোটআপু বলে ডাকেন। কারণ মায়শার বড় একটি বোন আছে। ওকে তিনি ডাকেন বড়আপু।

www.pathagar.com

– খুব ভালো করেছেন। নানুমণি। আজ কিন্তু আপনাকে আমি যেতে দেবো না। আমাকে আজ সিংহ ও ইঁদুরের গল্পটি শুনাতেই হবে।
– আচ্ছা আচ্ছা, হবে ইনশাআল্লাহ। এবার চলো আমরা ঘরে যাই।

মায়শা নানুর আঙ্গুলে ঝুলতে ঝুলতে বাসায় এসে ঢোকে। নানুর পাশে বসে অপেক্ষা করতে থাকে চিপসের প্যাকেটের। নানুমণি ওদের জন্য নিয়ে এসেছেন নিজের গাছের আম, কাঁঠাল ও পিঠা। সবাই সে সব গোছানো নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু ওদিকে মায়শা অনেকক্ষণ চিপসের প্যাকেটের কচমচ শব্দের অপেক্ষায় থেকে ভেবেছে, আজ আর নানুমণি চিপস আনেননি। মনের চাপাকষ্টে আস্তে উঠে গিয়ে নিজের বেডরুমে ঢুকে বালিশে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। আম্মু হঠাৎ রুমে গিয়ে দেখেন মায়শা কাঁদছে। আদর করে কোলে তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করেন,

– কী হয়েছে মামণি? কাঁদছো কেন?
ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে জবাব দেয় মায়শা
– আম্মু, নানুমণি আজকে চিপস আনেননি।
– হ্যাঁ, তাই নাকি? চলতো আমরা নানুমণির কাছে যাই। নানুমণি আজকে কেনো চিপস আনলেন না মায়শার জন্য!
চিপসের কথা বলায় নানুমণি জিব কাটলেন।
– সরি ছোটআপু। আমি তোমাকে আজ চিপস দিতে একদম ভুলে গেছি। এই নাও তোমার চিপস।

বলতে বলতেই পকেট থেকে দুটি চিপসের প্যাকেট বের করে দেন। এবার মায়শার মনের মেঘ কেটে খুশির সূর্য ঝলমল করে ওঠে।

খাওয়া-দাওয়া শেষে নানুমণি তখন বিশ্রাম নেবার জন্য শুয়েছেন। সুযোগ বুঝে মায়শা গিয়ে হাজির গল্প শোনার জন্য।
– নানুমণি বলেছিলাম না সিংহ ও ইঁদুরের গল্পটি আজকে আমাকে শুনাতে হবে?
– আচ্ছা নানুমণি, ঐ ছোট্ট ইঁদুরটি কী করে অতোবড় সিংহটিকে বাঁচালো?
– ইঁদুরের সামনের চিকন চিকন দাঁত দেখেছো, ছোটআপু? ওগুলোতে খুব ধার আছে, ওরা দাঁতগুলো দিয়ে সবকিছু কেটে টুকরা টুকরা করতে পারে।
– ওদের দাঁত ভেঙে যায় না নানুমণি?
– না আপু, ওদের সামনের দাঁতগুলো ক্ষয় হয়ে গেলে আবার বড় হয়।
– খুব মজা তো? আচ্ছা নানুমণি, ইঁদুরটি কেনো সিংহকে বাঁচাতে গেলো, ওতো মানুষ খায়?

www.pathagar.com

– জানো না আপু? সিংহটি একদিন ইঁদুরকে বাঁচিয়েছিল। সেই উপকারের কথা ইঁদুরটি কখনো ভুলেনি। তাই সুযোগ পেয়ে ইঁদুরটি তার প্রতিদান দিলো।
– নানুমণি প্রতিদান কী?
– প্রতিদান হলো, তোমাকে কেউ কিছু দিলে তুমিও তাকে কিছু দিবে। তোমাকে কেউ সাহায্য করলে তুমিও তাকে সাহায্য করবে। তোমাকে কেউ আদর করলে তুমিও তাকে আদর করবে, এটাও একরকম প্রতিদান।

এভাবে গল্প করতে করতে একসময় ঘুমিয়ে যায় মায়শা। মায়শা ছোট হলেও বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারে। প্রতিটি কথায় ও আচরণে তার বুদ্ধির প্রকাশ ঘটে। সবার কাছে নানারকম প্রশ্ন করে সে অনেক কিছু জেনে নিয়েছে। কে কীভাবে কথা বলে এসবও সে হুবহু নকল করতে পারে। কোথাও বিয়ে খেতে গেলে বউকে কিভাবে সাজানো হয়েছে তা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখে আসে। তারপর বাসায় এসে নিজেও সেভাবে সাজার ব্যর্থ প্রয়াস চালায়। আম্মুর ওড়না দিয়ে শাড়ি পরে। তারপর শুরু হয় বউরূপী মায়শার রকমারি ডায়লগ। এসব সে একমনে বসে চুপচাপ করতে থাকে। আম্মু-আব্বু তা দেখে মিটমিট করে হাসেন।

এভাবে চলতে থাকে মায়শার দিনকাল। একদিন হঠাৎ মায়শার আম্মু একটি জরুরি টেলিফোন পেয়ে বিচলিত হয়ে পড়েন। মায়শার নানুমণির স্ট্রোক করেছে। তিনি বামপাশ প্যারালাইজড হয়ে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। তড়িঘড়ি মায়শার আম্মু মায়শাকে নিয়ে চলে যান ওর নানুমণিকে দেখতে। দীর্ঘদিন চিকিৎসা চলে কিন্তু কিছুতেই উন্নতি হয় না। তিনি শুধু চোখ মেলে তাকান কিন্তু সে চাওয়াতে নেই কোনো সুস্পষ্ট দৃষ্টি। মায়শা তার প্রিয় নানুমণির পাশে গিয়ে বসে। মাথায় কচি হাত বুলায় আর মোলায়েম সুরে ডাকে,
– নানুমণি! ও নানুমণি! আমি সেই মায়শা! আপনি আমাকে চিনেছেন? আপনি না আমাকে প্রতিদানের কথা বলেছিলেন? আমিও আপনাকে চিপস কিনে দিবো, কথা বলেন, নানুমণি! মায়শার সে ডাক ওর নানুমণি বুঝতে পেরেছেন কিনা তা কেউ জানে না। তবে ওর ডাকে তিনি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন আর সেই সাথে দুচোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে কয়েক ফোঁটা অশ্রু।

www.pathagar.com

আমার আপু

আমার বাবা ছিলেন সংসারের বড় ছেলে। আমার দাদার অকাল মৃত্যুর পর বাবা তার মা এবং ছোট পাঁচ ভাই-বোনের সমস্ত দায়িত্ব কখন যে সযতনে কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন তা তিনি নিজেও বলতে পারবেন না। ভাইবোনের ভরণ-পোষণ, লেখা-পড়া সেই সাথে মায়ের প্রতি গভীর ভালোবাসায় এতোটাই মনোযোগী ছিলেন যে, নিজের সংসার করার কথা মনেও করতে পারেননি। যখন স্মরণ হলো ততোদিনে জীবনের আটত্রিশটি সোনালি বসন্ত নিয়েছিলো বিদায়। তারপর দাদির অনুরোধে সংসারের মায়ায় নিজেকে জড়ালেন ঊনচল্লিশ বছর বয়সে। একে একে জন্ম হলো আমাদের দুই বোনের। আমাদের কোনো ভাই ছিলো না। বাবার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ দুই ফুফুর বিয়ে হলো অভিজাত পরিবারে। তিন চাচা হলেন প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিক। তারপর চাচারা সংসার পেতে যার যার মতো আলাদা হয়ে গেলেন।

আমরা বড় হতে লাগলাম। ওদিকে বাবাও বার্ধক্য অবস্থায় পৌঁছে গেলেন। জীবনে যা কিছু উপার্জন করেছেন সবই ব্যয় করেছেন ভাই-বোনদের প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। নিজের জন্য কোনো কিছুই রাখা সম্ভব হয়নি এবং প্রয়োজনও বোধ করেননি। তিনি ভাবতেন, আমার ভাই-বোনই তো আমার সম্পদ। তারা মানুষ হলে আমার সন্তানদের দেখাশোনা করার দায়িত্ব তারাই নিবে।

বাস্তবে দেখা গেলো সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র। সহযোগিতা করা তো দূরের কথা, চাচা ও ফুফুরা বাড়ি আসাই বন্ধ করে দিলেন। উপরন্তু দাদার সম্পত্তির কিছু অংশ তারা কৌশল করে আয়ত্ত করে নিলেন। আমি ঢাকার একটি প্রতিষ্ঠিত কলেজে ভর্তি হলাম। বাড়ি মফস্বলে হওয়ার কারণে থাকতে হলো হোস্টেলে। কিন্তু আমার বাবার পক্ষে আমাদের দুজনের পড়ালেখার খরচ চালানো কঠিন হয়ে পড়লো। আমি ছিলাম বাবা-মার বড় সন্তান। তাই বাবার কষ্টটা আমি বুঝতে পারলাম। বাবাকে বললাম,

– বাবা আমার হোস্টেল চার্জ ও লেখাপড়ার খরচ আমি নিজেই ব্যবস্থা করতে পারবো।

www.pathagar.com

শুরু করলাম লেখাপড়ার পাশাপাশি টিউশনি করা। কষ্ট করে আমার দিনগুলো চলো যাচ্ছিলো। কিন্তু বাবাকে কিছুই বুঝতে দিলাম না। একদিন হঠাৎ মায়ের চিঠি পেলাম। মা অনেক কেঁদে-কেটে লিখেছেন,

সীমু, তোর বাবার অবস্থা ভালো না। তোর ছোট বোন রীমুর লেখাপড়ার খরচ আর কোনোভাবেই জোগাড় করতে পারছি না। মা, যদি তুই পারতি, শ'দুয়েক টাকার ব্যবস্থা করতে, পারলে রীমুটার লেখাপড়া কষ্ট করে চালিয়ে নিতে পারতাম। তা না হলে যে ওর আর মানুষ হওয়া হবে নারে। আমি জানি মা, তোর খুব কষ্ট হবে, তবু তোকে না বললে আমি আর কাকে বলবো, বল?

মায়ের চিঠি আমাকে খুব উদ্বিগ্ন করে তুললো। কোনো কূলকিনারা না দেখে চিঠি হাতে বালিশে মুখ গুঁজে অঝোরে কাঁদতে লাগলাম।

অনেকক্ষণ পর আমার মাথায় আলতো হাতের স্পর্শ অনুভব করলাম। অত্যন্ত মায়াভরা এক কণ্ঠ,

– সীমু কী হয়েছে বোন, কাঁদছো কেন? কষ্টের কথা আমার সাথে একটু শেয়ার করো। দেখবে অনেক হালকা হয়ে যাবে।

আমি কাঁদতে কাঁদতে উঠে জড়িয়ে ধরলাম আপুকে। আস্তে করে বাড়িয়ে দিলাম মায়ের চিঠিটি। আপু দ্রুত এক নজর দেখে বুঝে নিলেন ব্যাপারটা কী। মোলায়েম সুরে বললেন,

– সীমু চিন্তা করো না বোন। আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও। নিশ্চয়ই তিনি একটি সুন্দর ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

সেদিনের পর থেকে আর কখনও আমাকে টাকার কথা ভাবতে হয়নি। প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই অত্যন্ত গোপনে সুন্দর একটি খামে দুইশত টাকা দিয়ে খামের উপর ছোট করে লিখে রাখতেন, আপু। সেই সুন্দর খামটি আমার আপু কখন যে হ্যান্ডব্যাগে ঢুকিয়ে রাখতেন তা আমি টেরই পেতাম না। আপু এই টাকা নিজের খরচের টাকা থেকে দিতেন ফলে তার নিজের অনেক কষ্ট করে চলতে হতো। আপু এই টাকার ব্যাপারটা আমার সাথে কখনও মুখে কিছু বলতেন না। আমিও আপুর এই নীরব দানে বাধা দিতে পারিনি। কারণ, একে তো আমার দেয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছিলো, তার উপর আপুকে কষ্ট দেয়ার সাহস আমার হয়নি। এটা ছিলো আপুর অত্যন্ত মহব্বতের গোপন দান।

এই হলো আমার আপু। আমার সিনিয়র এক বোন। যার সাথে আমি দীর্ঘ তিনটি বছর হোস্টেলের একই রুমে কাটিয়েছি। কী যে মধুর সম্পর্ক ছিলো আমাদের! আমার এই আপুর জন্যই আমার ছোটবোনের বিএ পাস করে ভালো ঘরে বিয়ে হয়েছে।

আমার এই মমতাময়ী আপুকে আমি কী করে ভুলবো? যার কথা মনে হলে আজও মনের অজান্তেই দুচোখ বেয়ে আশ্রুধারা প্রবাহিত হয়। অবচেতন মনে কখন যে দুহাত প্রসারিত করি মহান রবের দরবারে যিনি সৃষ্টি করেছেন সুন্দর মনের এ মানুষটিকে।

www.pathagar.com

বেঁচে আছে আজো মানবতা

স্কুলগেটে একমাত্র ছেলে রাদিফকে নামিয়ে দিয়ে দ্রুত গাড়িতে উঠে বসেন ডা. মারদিয়া। তার সাদা রঙ-এর টয়োটা করোলা গাড়ির স্টিয়ারিং ঘুরাতেই ছুটে চললো শাঁ শাঁ বেগে, তার নিজের প্রতিষ্ঠিত মাদার এন্ড বেবি কেয়ার হসপিটালের দিকে। বড্ড দেরি হয়ে গেছে। হসপিটালে আজ তার সকাল নটায় জরুরি এক সিজার আছে। পেসেন্টের অবস্থা বেশ জটিল। বারবার ঘড়ি দেখছেন মারদিয়া। আটটা পঁয়তাল্লিশ মিনিট। ছেলেটাকে ঘুম থেকে উঠাতে আজ তার বেশ বেগ পেতে হয়েছে। অনেক আদর করে, শুক্রবার ফ্যান্টাসি কিংডমে নিয়ে যাওয়ার ওয়াদা করে তবে তো উঠাতে পেরেছেন। মাঝে মাঝেই তাকে এ ধরনের ওয়াদা করতে হয় ছেলের সাথে। কী করবেন! একমাত্র ছেলে। কষ্ট হলেও অনেক কিছু করতে হয় তাকে। ছেলেটা তার বড্ড আদুরে। দশ বছরের এ ছেলেটিকে ঘিরেই তার সমস্ত স্বপ্ন আবর্তিত। মাকে ছাড়া সেও কিছুই বুঝে না। বাবাকে একটু ভয় পায় বলে তার সমস্ত আবদার তার মায়ের কাছে। ভাবতে ভাবতে ডানে মোড় নিতেই হঠাৎ খট করে একটি শব্দ হয়। পাশ ফিরে একজন অর্ধবয়সী মহিলাকে পড়ে যেতে দেখে ভড়কে যান ডা. মারদিয়া। একি হলো! এক্সিডিন্ট! তাড়াতাড়ি গাড়ি নিয়ে পালাতে গিয়েও পারলেন না। আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার ভয়ও সাথে সাথে কী যেনো একটু আকর্ষণ অনুভব করলেন। কাকে আমি মেরে যাচ্ছি? চেহারাটা কেমন যেনো চেনা চেনা মনে হচ্ছে! ব্রেক কষলেন ডা. মারদিয়া। তাড়াতাড়ি নেমে গিয়ে আহত মহিলাটিকে উঠাতে গিয়েই চিনতে পারলেন তাকে। এ যে তার চির চেনামুখ। তার কলেজ লাইফের বান্ধবী নাসরিন সুলতানা। এক মুহূর্ত দেরি না করে তাকে গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে আবার ছুটলেন হসপিটালের দিকে।

www.pathagar.com

প্রাথমিক চিকিৎসার পর নাসরিন সুলতানা বেশ সেরে উঠলেন। ডা. মারদিয়া যদিও তাকে চিনেছেন কিন্তু একটু অবাক হলেন এই ভেবে যে, এই নাসরিন কতো সুন্দরই না ছিলো! এতো সহজে এতোটা বুড়িয়ে গেলো কী করে! চেহারায় মলিন ভাব। কপালে বলিরেখা বয়সের ছাপ নির্দেশ করছে। অথচ এতোটা বয়স তো ওর হয়নি। বড় জোর আটত্রিশ হবে। কলেজ পেরুলেই ওর বিয়ে হয়ে গিয়েছিলো বেশ বড়লোকের ছেলের সাথে। ওরা ওকে খুব পছন্দ করে নিয়েছিলো। তারপর থেকে মারদিয়ার সাথে আর যোগাযোগ নেই।

ডা. মারদিয়ার নির্দেশে বেশ যত্নসহকারেই ট্রিটমেন্ট চললো নাসরিনের। দুদিন পর মারদিয়া নাসরিনের ঘনিষ্ঠভাবে খোঁজ-খবর নেবার জন্য তার কেবিনে গিয়ে বসলো। দু'বান্ধবীতে অনেকক্ষণ আলাপ চললো। এক পর্যায়ে নাসরিন তার দুর্ভাগ্যের কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। তিনি বলতে লাগলেন, কীভাবে তার সুখের সংসারে নেমে এসেছে দুঃখের কালো মেঘ। স্বামীর সংসারে তার ভালোই কাটছিলো। ছিলো সুখ, প্রাচুর্য। বিয়ের দুবছর যেতে না যেতেই তিনি মা হতে চললেন। সংসারে তার আদরও বেড়ে গেলো। স্বামী ফলমূল সব সময়ই আনতে লাগলেন। সংসারে নতুন অতিথি আগমনের প্রতীক্ষা চলতে লাগলো। নাসরিনের শ্বশুর-শাশুড়ি বেশ খুশি। তাদের প্রথম ছেলের ঘরে প্রথম সন্তান। প্রথম দাদা-দাদি হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় চারদিকে সাজ সাজ রব। চললো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান।

মফস্বল শহর। সপ্তাহে একদিন ডাক্তার বসেন। তাও আবার পুরুষ ডাক্তার। ডাক্তারের এসিস্ট্যান্ট মহিলাকে দিয়েই সাধারণত চেকআপ করানো হয় মহিলা রোগীদের। সেখানেই চলতে থাকে নাসরিনের চেকআপ। দেখতে দেখতে সময় ঘনিয়ে এলো। শুরু হলো প্রসব ব্যথা। নাসরিনকে নিয়ে যাওয়া হলো ডাক্তারের চেম্বারে। ডাক্তারের বসার দিনের আর তিনদিন বাকি। সহকারী মহিলাটি আর দুজন মহিলাকে নিয়ে সন্তান প্রসবের চেষ্টা চালালো। কিন্তু ভাগ্য ছিলো অত্যন্ত বিড়ম্বিত। দীর্ঘক্ষণ অপটু হাতের হ্যান্ডেলিং-এর ফলে সন্তান আর পৃথিবীর আলো বাতাস দেখতে পেলো না। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করলো। এদিকে নাসরিন তীব্র ব্যথায় ছটফট করতে করতে জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। ভূমিষ্ঠ হলো মৃত সন্তান। কিন্তু হায়! তিনি শুধু সন্তানই হারালেন না। তার শরীরের হয়ে গেলো এক অপূরণীয় ক্ষতি। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস। সারা জীবনের জন্য ভিভিএফ রোগে আক্রান্ত হলেন নাসরিন। তার সুস্থ-সুন্দর

www.pathagar.com

শরীরে নেমে এলো দুর্ভোগ। সব সময় তার শরীর থেকে প্রস্রাবের উৎকট গন্ধ আসতো। সবাই তাকে ঘৃণা করা শুরু করলো। স্বামীর সংসারে সে হয়ে গেলো বাড়তি বোঝা। সঠিক চিকিৎসার অভাবে তার শরীর দিন দিন ক্ষীণকায় হয়ে যাচ্ছিলো। স্বামী আবার বিয়ে করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলো। শ্বশুরবাড়ির অন্য সদস্যদের আচরণও দুর্বিষহ হয়ে উঠলো। অবশেষে বিতাড়িত হলেন নাসরিন তার সাজানো সুখের সংসার থেকে। তার আর সন্তানের মা হওয়া হলো না। উপরন্তু সুখের ঘর, স্বপ্ন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। এই দুর্বিষহ জীবন নিয়ে আর কারও করুণার পাত্র না হবার সিদ্ধান্ত নিলেন নাসরিন। তাই তো বৃদ্ধ বাবার সংসারে ফিরে না গিয়ে পাগলিনীর মতো এদিক-সেদিক ছুটে বেড়াতে লাগলেন। তারপর থেকে নাসরিন ঠিকানাবিহীন। উদ্দেশ্যহীন তার জীবনযাত্রা।

সব ঘটনা শুনে ডা. মারদিয়া কেঁদে ফেললেন। বান্ধবীকে জড়িয়ে ধরে আশ্বাস দিলেন, যতো টাকা লাগুক না কেনো আমি তোকে সারিয়ে তোলার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। প্রয়োজনে তোকে আমি বিদেশে নিয়ে যাবো। ফিরিয়ে দেবো তোকে আবার স্বাভাবিক জীবন।

নাসরিনের দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। তারই মাঝে একচিলতে আলোর ঝিলিক। এ যেনো নিভু নিভু প্রদীপ শিখায় নতুন করে অক্সিজেন সঞ্চালন।

www.pathagar.com

বিচিত্র পৃথিবী

ঘন কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন পৃথিবী। গাছ-পালা, পশু-পাখি, সূর্যের উষ্ণতার প্রতীক্ষার প্রহর গুনছে। এমনি একটি সময়ে শীতে কাঁপতে কাঁপতে রিকশার প্যাডেলে পা রাখে হোসেন মিয়া। সারারাত তার কেটেছে এপাশ ওপাশ করে। চল্লিশোর্ধ ক্লান্ত জীর্ণ শরীর। সাতজনের সংসারের বোঝা টেনে টেনে সে এখন ক্লান্ত। আর যেনো বইতে পারছে না। সকালে ফজরের আজানের আগে ঘুম থেকে উঠে স্ত্রী রহিমন নেছাকে সে জাগিয়ে তুললো। তাড়াতাড়ি ফজরের নামাজ সেরে রহিমনের কাছে ভাত চায়। রহিমন একদলা ঠান্ডা ভাত বেড়ে দেয় সানকিতে। তাই সে মরিচ লবণ ডলে খেয়ে নেয়। খাওয়ার সময় রহিমনের চিন্তিত চেহারা দেখে সান্ত্বনা দিয়ে বলে,

– চিন্তা কইরো না বউ। আল্লাহ একটা ব্যবস্থা কইরা দিবেই। তুমি সারাদিন নামাজ পইড়া দোয়া করতে থাকো। মান-ইজ্জত বাঁচানোর মালিক আল্লাহ।
– আপনের শরীরডাও তো বেশি ভালা না। কতো আর খাটতে পারবেন। জোয়ান পুলাগো মতোন আপনের তো আর অতো শক্তি নাই যে একটানা না জিরাইয়া খাটবেন।
– অতো ভাইবো না বউ। মেয়েকে সৎপাত্রে তুইলা দেওয়া একটা ফরজ কাজ। এই ফরজ কাজে আল্লাহই আমাগো সাহায্য করবে।
হোসেন মিয়া রিকশার হ্যান্ডেলে হাত দিয়ে ভাবতে থাকে, পনের জন ইষ্টি আইবো আজ সন্ধ্যায় বড় মেয়ে খোদেজাকে দেখতে। ভালোমন্দ চারটে খাবার তো দিতে অইবো সামনে। দুই কেজি গরুর গোস্ত না অইলে তো চলবো না। তাতে লাগলো দুইশ ট্যাকা। পাঁচকেজি চালের দাম লাগবো আশি ট্যাকা। পিঁয়াজ, মরিচ, তেল আর সব মসলাপাতি মিলাইয়া লাগবো আরও চল্লিশ

www.pathagar.com

ট্যাকা। তার মানে রিকশার জমা টাকা বাদে আমার জোগাড় করতে অইবো আরও তিনশ বিশ ট্যাকা। মাথাটা ঘুরাইয়া যাইতাছে। তবু আল্লাহ ভরসা কইরা রওনা হই।

হোসেন মিয়া জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জের বাসিন্দা ছিলো। বাবার দেয়া ভিটায় সে ছেলে-মেয়ে নিয়ে থাকতো। যে সামান্য জমি তার ছিলো তাতে চাষ করে সে মোটামুটি ভালোভাবেই সংসার চালাতো। কিন্তু যমুনার ভয়াল গ্রাস থেকে সে তার ভিটেমাটিটুকু বাঁচাতে পারেনি। শত শত একর জমির সাথে যমুনাবক্ষে বিলীন হয়ে যায় তার শেষ সম্বলটুকুও। তাই সে এখন পথে বসেছে। দুই বছর আগে প্রতিবেশী পরিবারগুলোর সাথে সে ঢাকায় চলে এসেছে। আশ্রয় নিয়েছে খিলগাঁ রেললাইনের পার্শ্ববর্তী বস্তিতে। পলিথিন দিয়ে বানানো ছোট্ট একটি খুপড়ির মতো তার ঘরে সে আগলে রেখেছে পাঁচ-পাঁচটি সন্তানকে। ইচ্ছে ছিলো ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া করাবে। হোসেন মিয়ার বড় তিন সন্তানই মেয়ে। কয়েকদিন সে ওদের খিলগাঁ রেলগেট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠিয়েছে। কিন্তু বখাটে ছেলেদের উৎপাতে সে সাহস পায় না। সে ভাবে লেখাপড়ার চাইতে মানইজ্জত বড়। তাই পড়াশুনা বাদ দিয়ে তাদের ঘরে বসিয়ে রেখেছে। স্ত্রী রহিমনকেও তাই সে কোথাও ঝি-এর কাজে যেতে দেয় না। বলে, – তুমি বরং পুলাপান দেখাশুনা করো। আমি যা পারি রোজগার করমু। আল্লাহই বরকত দিবো। হোসেন মিয়া দ্বীনের এই জ্ঞানটুকু পেয়েছে কলিমচাচার কাছ থেকে। তিনি গ্রামের মৌলভী। সারাদিন ক্ষেতে কাজ করে রাতে সে শরিক হতো কলিমচাচার কিতাব পড়ার আসরে। কলিমচাচা অনেক সুন্দর সুর করে পুঁথি পড়তে পারেন। তিনি নবী-রাসুলের বিভিন্ন কাহিনী সুরে সুরে ছন্দময় করে ফুটিয়ে তোলেন। তার আসরে অনেক লোকের সমাবেশ ঘটে। মানুষকে তিনি সৎপথে চলার পরামর্শ দেন। হোসেন মিয়াও তাই কলিমচাচার শিক্ষাকে মেনে চলতে চেষ্টা করে।

রিকশা নিয়ে বিশ্বরোডের সামনে দাঁড়ায় হোসেন মিয়া। কুয়াশায় দুই তিন গজ সামনের জিনিসও দেখা যাচ্ছে না। এই সাত সকালে কে বের হবে। কোনো রিকশা তো নেইই। কোনো গাড়িও দেখা যাচ্ছে না। শীতে ঠক ঠক করে সে কাঁপছে আর বঙ্গবাজারের সামনের ফুটপাত থেকে চল্লিশটাকায় কেনা চাদরটি দিয়ে শরীরটা প্যাঁচানোর চেষ্টা করছে।

বেলা এগারোটা নাগাদ তার আয় হয় একশো টাকা। কী করবে? রাস্তায় যে জ্যাম! কোনো কোনো জায়গায় আধঘণ্টা থেকে একঘণ্টা পর্যন্ত বসে থাকতে

www.pathagar.com

হয়। অসহ্য লাগে। কিন্তু কী আর করা? অনেক কষ্টে জ্যাম ছুটে যাওয়ার অপেক্ষায় থাকতে হয়।

শাহবাগের মোড়ে সে যাত্রীর জন্য অপেক্ষা করে। পকেট থেকে টাকা বের করে আবার গুনে দেখে একশ আশি টাকা। তিনজন যুবক ইউনিভার্সিটি বলে উঠে বসে। হোসেন মিয়া তাদেরকে নিয়ে কলাভবনের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে নামায়। ছেলে তিনটি লাফ দিয়ে নেমে ভাড়া না দিয়েই চলে যেতে থাকে। হোসেন মিয়া ডাকে,

– ভাইজান, ভাড়া দিলেন না?
– ভাগ বেটা, তোর সাহস তো কম না। আবার ভাড়া চাস?

বলতে বলতে দোতলায় উঠে যায় সিঁড়ি বেয়ে। হোসেন মিয়া নিজের নসিবকেই দায় করতে থাকে।
– পোড়া কপাল, এর চাইতে আমারে একটা লাথি মাইরা থুইয়া যাইতো। খোদা, তুমি অভাগার দিকে ফিরা চাও। রিকশা টানতে টানতে সে চলে যায় রোকেয়া হলের সামনে। দুটি মেয়ে হাতের ইশারায় ওকে ডাকে।
– যাবেন, বাসাবো?
– হ, মামনি। পঁচিশ টাকা নিমু।
– চলেন।
বলেই উঠে বসে মেয়ে দুটি। অনেক কষ্ট করে প্যাডেল করতে থাকে হোসেন মিয়া। কারণ সেই সাত সকালে যে চারটে ঠাণ্ডা ভাত সে খেয়েছিলো তারপর আর একটু পানিও খায়নি। ক্ষুধায় পেটটা চোঁ চোঁ করছে। শরীর আর চলতে চায় না। রোকেয়া হল থেকে শাহবাগের মোড়, কাকরাইল হয়ে সে চলছে সোজা রাজমণি সিনেমা হলের সামনে দিয়ে। পথে পার হলো মিডনাইট সান, আনন্দ কমিউনিটি সেন্টার আরও কয়েকটি পার্টি হাউজ। সবগুলোর সামনেই প্রচণ্ড ভিড়। রঙ বেরঙ-এর সাজে সজ্জিত নারী-পুরুষের আনাগোনা। হোসেন মিয়া ফিসফিসয়ে বলে ওঠে,

– এইসব হলগুলোতে সাহেবগো পোলা মাইয়্যাগো বিয়া হয়। কতো হাজার হাজার ট্যাকা খরচ করে। একটা বিয়ায় তারা যে খরচ করে তা আমাগো মতোন পরিবারের লোকেরা সারা জিন্দেগিভর খাইয়্যা শেষ করতে পারবো না।
মেয়েরা জিজ্ঞেস করে,
– কিছু বলছেন চাচা?

www.pathagar.com

– কী আর কমু মা, বড় পেরেশানিতে আছি। আইজ আমার খোদেজা মায়েরে দেখতে আইবো। পছন্দ অইলে বিয়া পড়াইয়া ফেলাবো। তাদের তো কিছু খাওন-দাওন লাগবো। হিসেব কইরা দেখলাম তিনশ বিশ টাকার কমে এই ধাক্কা সামলানো যাইবো না। তাই আমি তিনশ বিশ টাকা যোগাড়ের ধান্দায় ঘর থেকে বাইর অইছি। ভাগ্য ভালা না মা। এ পর্যন্ত দুইশ ট্যাকাও পাই নাই। ওই দিকে রিকশা বদলীর সময় অইয়্যা আইলো প্রায়।

মেয়ে দুটি নামলো বাসাবো খেলার মাঠের পাশে। তারা নামার সময় ভাড়া পঁচিশ টাকা ছাড়াও বিশ টাকার একটি নোট বাড়িয়ে দিলো।
– চাচা এই টাকাটা আপনার খোদেজার বিয়ের জন্য দিলাম। আমাদের জন্য দোয়া করবেন, আমাদের সামনে অনার্স পরীক্ষা।
বলেই মেয়ে দুটি ঢুকে যায় একটি বাসার ভিতরে। হোসেন মিয়া খুশিতে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকে।
– আল্লাহ, তুমি মাইয়্যা দুইড্যার পরীক্ষা ভালা কইর‍্যা দেও। আল্লাহ এই অভাগার দোয়া কবুল করো।
রিকশা থামিয়ে পাঁচটাকার রুটিভাজি কিনে খায় হোসেন মিয়া। পানি খেয়ে খানিক জিরিয়ে নেয়। ভাড়ার জন্য অপেক্ষা করে। এটাই হয়তো তার আজকের শেষ ভাড়া। এখনও অনেক টাকা বাকি। আল্লাহর কাছে সে সাহায্য চেয়ে দোয়া করতে থাকে। অবশেষে ভাড়া পেলো। যাত্রী একজন অল্প বয়সী ভদ্রমহিলা।

রিকশা চলতে শুরু করে। একটু যেতেই খিলগাঁও রেলগেটের সামনে দীর্ঘ জ্যামে পড়ে। তিন বছর যাবৎ ফ্লাইওভার নির্মাণের জন্য রাস্তায় প্রচণ্ড জ্যাম হয়। কবে যে শেষ হবে, এ এলাকাবাসী একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলবে, আল্লাহই ভালো জানেন। হোসেন মিয়া রিকশা থেকে নেমে ব্রেক ধরে দাঁড়িয়ে থাকে নির্বিকার হয়ে। মনের আয়নায় ভেসে উঠতে থাকে মেয়ে খোদেজার নিষ্পাপ মায়াবী মুখ। হোসেন মিয়া তার মেয়েদের খুব ভালোবাসে। সে শুক্রবার জুমার খুৎবায় ইমাম সাহেবের মুখ থেকে শুনেছিলো আমাদের নবী মেয়েদের খুব ভালোবাসতেন। মেয়ে শিশুকে তিনি ছেলেদের তুলনায় বেশি আদর করতে বলেছেন। বাজার থেকে কিছু কিনে আনলে মেয়ে শিশুকে আগে দিতে বলেছেন। হোসেন মিয়া সেই খুৎবা শুনার পর থেকে তাই করে। সেই আদরের মেয়ের ভাগ্যের কথা ভেবে তার ভিতরটা গুমরে কেঁদে ওঠে। অনেক চেষ্টা করেও যেনো সে নিজেকে থামাতে পারছে না। ভিতরের কান্নার ঝাঁকুনিতে রিকশাও একটু দুলে ওঠে। রিকশায় উপবিষ্ট ভদ্রমহিলার যা নজর এড়ালো না।

www.pathagar.com

– ভাই, আপনার কোনো সমস্যা হচ্ছে? খারাপ লাগছে?
– আপা, আমরা গরিব মানুষ, পোড়া কপাল, দুঃখ-কষ্ট তো আমাগো সারা জীবনের সঙ্গী। আপাগো, আমি বুঝি মেয়ের বিঁয়ার তিনশ বিশ ট্যাকা আইজ আর যোগাড় করতে পারমু না। আমার মেয়েডার কপাল কী এতোই খারাপ। আইজ সন্ধ্যায় পনের জন ইষ্টির সামনে আমি কী দিমু?

একটু পরেই জ্যাম ছুটে যায়। হোসেন মিয়া তাকে তার দুখের কথা বলতে বলতে মগবাজার গিয়ে পৌঁছে। ভদ্রমহিলা হোসেন মিয়ার দুঃখে কষ্ট পান। ভাড়া চুকিয়ে নেমে যাওয়ার সময় একটি একশ টাকার নোট হোসেন মিয়ার হাতে দিয়ে সে তড়িঘড়ি নেমে যেতে থাকে। হোসেন মিয়া আনন্দে আত্মহারা হয়ে দুহাত আকাশের দিকে তুলে অশ্রুসজল চোখে বলতে থাকে,
– হে আল্লাহ! তোমার এ বান্দা আইজ আমার প্রতি যেমন রহমদিল অইলো কাল হাশরের ময়দানে তুমি তার প্রতি অইও তেমনি রহমদিল। আমিন!

হোসেন মিয়া ভদ্রমহিলার চলার পথের দিকে চেয়ে থাকে আর ভাবতে থাকে, বিচিত্র এ পৃথিবীতে বিচিত্র রকম মানুষ। কেউবা গায়ে গতরে মানুষ হয়েও আচরণে পশুর চাইতে নিকৃষ্ট। আবার কেউ-বা মহান, উদার সাগরের মতো। আল্লাহ, দুনিয়ার সব মানুষ যদি তাদের মতো হতো!

www.pathagar.com

ধৈর্য

– মে আই কাম ইন স্যার?

প্রফেসর শোয়েব আহমেদ ফাইলে চোখ রেখেই বললেন,

– ইয়েস কাম ইন।

ধীর পায়ে রুমে ঢুকলো সোহায়লা– সুন্দর, লম্বা, হালকা-পাতলা গড়নের মেয়েটি।

– স্যার, আমি আর পরীক্ষা দিতে পারছি না। আমার খুব মাইগ্রেনের ব্যথা হচ্ছে, তাই আমার পরীক্ষা কনটিনিউ করা সম্ভব হচ্ছে না। স্যার, দয়া করে আমাকে ছুটি দেন। আমি বাসায় চলে যাবো।

– তাই নাকি? একটু শান্ত হয়ে বসতো মা। এটা তো ফাস্ট ইয়ারের টার্ম পরীক্ষা, ঠিক আছে, না হয় পরের টার্মে সেটা মেকআপ করে নিবে। আচ্ছা বলতো, তোমার এ সমস্যাটা কতো দিন যাবৎ?

– স্যার, আমি যখন স্কুলে পড়ি তখন থেকেই আমার মাইগ্রেনের ব্যথা হয়। মাঝে মাঝে বমিও হয়। দুই তিন দিন ব্যথায় আমি চোখ খুলতে পারি না।

– কিন্তু তুমি ছোট মানুষ। তোমার এতো সিভিয়ার মাইগ্রেনের পেইন হলো কীভাবে? কিছু মনে করো না মা, তোমাকে একটা পার্সনাল প্রশ্ন করি?

– বলেন স্যার, আই উইল নট মাইন্ড।

– তোমার ফ্যামিলিতে কোনো প্রোবলেম আছে?

হঠাৎ সোহায়লার গোলাপের পাপড়ির মতো ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠলো। ডাগর ডাগর চোখ দুটো ছাপিয়ে অশ্রুর ধারা বইতে লাগলো। কিছুক্ষণ সে কোনো কথা বলতে পারলো না। তারপর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললো,

www.pathagar.com

– স্যার, আপনি তো আমার খুব প্রিয় শিক্ষক, আই উইল নট হ্যাসিটেট টু টেল ইউ। একচুয়েলি, আমি ছোটবেলা থেকে কখনোই আমার বাবা-মাকে সুন্দরভাবে কথা বলতে দেখিনি। সারাক্ষণ শুধু ঝগড়া-বিবাদ ও উত্তেজনাপূর্ণ কথাবার্তা চলতে থাকে। আমার ছোট একটি ভাই ও একটি বোন আছে। আমরা তিনজন সবসময় খুব আতঙ্কের মধ্যে থাকি। আব্বু আর্মি অফিসার। আর আম্মু ঢাকা ভার্সিটি থেকে মাস্টার্স করেছেন। তিনি ছিলেন খুব মেধাবী। কিন্তু আমাদের লালন-পালনের কথা চিন্তা করে কোনো চাকরিতে জয়েন করেননি। আব্বু আমার আম্মুকে কেনো জানি একদম সহ্য করতে পারেন না। তিনি আমাদেরও কখনও কাছে ডেকে আদর করেন না। আব্বু বাসায় আসলে আমরা তিন ভাইবোন ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে আমাদের পড়ার টেবিলে বসে থাকি। কিন্তু লেখাপড়ায় মন বসাতে পারি না। সব সময় আতঙ্কিত থাকি, এই বুঝি শুরু হলো চিৎকার-চেঁচামেচি। মায়ের আর্তনাদ। কী করবো স্যার? আমি তাদের বড় সন্তান। আমি দুজনকে আলাদাভাবে বুঝানোর অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারিনি।

– উফ! এতো সাংঘাতিক অবস্থা। আমি কি উনাদের সাথে কথা বলবো মা?

– স্যার কোনো কাজ হবে না। আমার আত্মীয়-স্বজনরা অনেক চেষ্টা করেছেন। আববু-আম্মুর বন্ধু-বান্ধবরাও কম বুঝাননি কিন্তু হিতে আরো বিপরীত হয়েছে। আম্মু তো শুধু আমাদের মুখের দিকে তাকিয়েই রয়ে গেলেন। অথচ তার ফ্যামিলি হাইলি এডুকেটেড এবং ওয়েল অফ। নানুভাই ও মামা অনেক চেষ্টা করেছেন আমাদেরসহ আম্মুকে তাদের কাছে নিয়ে রাখার জন্য। কিন্তু আম্মু কিছুতেই রাজি হননি। বলেছেন, আমার সন্তানদের তো সামাজিক পরিচয়ের দরকার আছে, স্বামীর ঘর ছেড়ে আমি কী করে যাবো?

– মা, তোমাদের ফ্যামিলির কথা শুনে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। আমাদের সমাজের হাই সোসাইটিতে এমন অনেক ফ্যামিলি আছে যারা শুধুমাত্র সামাজিক, চক্ষুলজ্জার ভয়ে পারিবারিক বাঁধনকে টিকিয়ে রেখেছে। স্ত্রীদের দ্বারা স্বামীও নির্যাতিত হচ্ছে। পবিত্র এই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সামান্য ইগোর জন্য তারা দুর্বিষহ করে তুলছে।

– সে সব ফ্যামিলির সন্তানরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। কখনও তারা হয়ে যাচ্ছে বখাটে বা সন্ত্রাসী। তারা বাবা-মার আদর-সোহাগ থেকে বঞ্চিত হয়ে এসব পথ বেছে নিচ্ছে। তারা পরিবারকে শান্তির নীড় না ভেবে কুরুক্ষেত্র মনে করছে। দুঃখ হয় তাদের জন্য। এসব ছেলে-মেয়ের যদি প্রপার কাউন্সিলিং করা হতো তাহলে সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা অনেকাংশে কমে যেতো। এসব ছেলেই

www.pathagar.com

ইভটিজার হয়ে গড়ে উঠছে। আসলে পরিবার থেকে আদর্শ শিক্ষা না পেলে ছেলে-মেয়েরা বখাটে হবে, এটাই তো স্বাভাবিক। আইন করে ইভটিজিং বন্ধ করা যাবে না। তার জন্য প্রয়োজন আত্মিক সংশোধন, যা করতে পারে একটি আদর্শ পরিবার।

মা, তুমি তো তোমার বাবা-মায়ের বড় সন্তান। তোমাকে ভেঙে পড়লে চলবে কেনো? দুনিয়াটা আসলে সমস্যা সংকুল। এসব সমস্যাকে ওভারকাম করার জন্য প্রয়োজন সাহসী ভূমিকার।

বলতো মা, দুনিয়াতে কোন জিনিসটির সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন?

– স্যার, পরিবারের শান্তি।

– সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো, ধৈর্য।

মৃদু হেসে বললেন প্রফেসর শোয়েব।

– ধৈর্যের কোনো বিকল্প নেই, মা। সাথে সাথে আল্লাহপাকের কাছে সাহায্য চাইতে হবে। নামাজ পড়, মা?

– স্যার আমাদের বাসায় তো নামাজের কোনো প্রচলন নেই। তবে আমি ছোট বেলায় হুজুরের কাছে নামাজ শিখেছিলাম।

– ঠিক আছে, আমি আশা করবো এখন থেকে তুমি নিয়মিত নামাজ পড়বে, প্রতিদিন আল কুরআন থেকে দুই-তিনটি আয়াত ব্যাখ্যাসহ পড়বে, যেখান থেকে তুমি পাবে মেন্টাল পিস। বাবা-মাকে আরও বেশি ভালোবাসবে এবং তাদের সঙ্গ দিবে। তাদের জন্য আল্লাহর কাছে প্রাণ খুলে দোয়া করবে। তোমাদের ফ্যামিলিটাকে শান্তির নীড় বানানোর জন্য তোমাকেই পদক্ষেপ নিতে হবে। তোমার ছোট ভাইবোন দুটো তো তোমার কাছ থেকেই পাবে সাহস এবং পথচলার প্রেরণা। পারবে না মামণি?

– স্যার, আমি আপনার কথাগুলো মেনে চলার চেষ্টা করবো। প্লিজ স্যার, আপনি আমার জন্য দোয়া করবেন। কান্না জড়িত কণ্ঠে বললো সোহায়লা।

– অবশ্যই। তোমার মাইগ্রেনের ব্যথার এখন কী অবস্থা মা?

– স্যার, আই হ্যাভ গট রিলিফ!

www.pathagar.com

সুন্দরের হাতছানি

– মামণি ট্রেন এসে গেছে।
নকিবের ডাকে হাতে ব্যাগপত্র নিয়ে ওয়েটিংরুম থেকে বেরিয়ে এলেন রাহনুমা। মায়ের পিছে পিছে বেরিয়ে এলো লালরঙের সালোয়ার কামিজ ও মাথায় কালো স্কার্ফ পরা নওমি। হাতে ট্রাভেলিং ব্যাগ। সবার মাঝে আজ এক অন্যরকম আনন্দ। দীর্ঘ দশ বছর পর গ্রামে যাচ্ছেন রাহনুমা। বিয়ের পর ঢাকায় এসে কর্মজীবনের ব্যস্ততা ও বাচ্চাদের লেখাপড়া, সব মিলিয়ে আর গ্রামে যাওয়া হয়নি। তাছাড়া রাহনুমার বাবা-মা এখন ঢাকাতেই থাকেন। গ্রামে তেমন কেউ থাকে না। বাড়িতে কেয়ারটেকার দেখাশুনা করে। পাশাপাশি বাড়িতে থাকেন দাদার অন্য ভাইদের ছেলে-মেয়েরা। সবার মধ্যে রয়েছে বেশ আন্তরিকতার সম্পর্ক। রাহনুমার ছেলেবেলাটা এই গ্রামেই কেটেছে। তাই গ্রামের প্রতি রয়েছে এক গভীর আকর্ষণ।

এয়ারপোর্ট স্টেশন থেকে সুবর্ণ এক্সপ্রেস ছুটে চলেছে চট্টগ্রামের উদ্দেশে। নকিব ও নওমি জানালার পাশে গিয়ে বসলো। সেই ছোটবেলায় মায়ের সাথে একবার নানুবাড়ি গিয়েছিলো তারা। তখন ওদের নানু-নানা গ্রামেই থাকতেন। তারপর বড় মামার চাকরি হওয়ার পর তারা চলে আসেন ঢাকায়। তাই তাদের আর গ্রামে যাওয়া হয়নি। এস.এস.সি পরীক্ষার পর নকিব মায়ের কাছে আবদার করলো,

– চলো না মামণি, এবার আমরা গ্রাম থেকে ঘুরে আসি।
রাহনুমার স্বামী সালমান বললেন,

www.pathagar.com

– এক কাজ করো, আগামী সপ্তাহে আমাকে তো মালয়েশিয়া যেতে হচ্ছে একটি কনফারেন্সে এটেন্ড করার জন্য, এই ফাঁকে তোমরাও গ্রাম থেকে ঘুরে আসো।
রাহনুমা শুক্র-শনিসহ পাঁচদিনের ছুটি মেনেজ করলেন। তারপর আজ অনেক অপেক্ষার সেই যাত্রা।

নকিব, নওমি চলন্ত ট্রেন থেকে গাছপালা, বাড়িঘরগুলোর ছুটে চলা দেখছে আর নানারকম খোশগল্পে মেতে উঠেছে। মা রাহনুমা দৈনিক পত্রিকার পাতায় চোখ বুলাচ্ছেন। আজকাল পত্রিকা খুললেই শুধু দেখা যায় চারদিকে হত্যা, সন্ত্রাস, দুর্ঘটনার খবর। সীমান্ত এলাকায় ঢুকে বিএসএফ-এর ধান কেটে নিয়ে যাওয়া, গরু-ছাগল ধরে নিয়ে যাওয়া, এমন কী পাখির মতো নির্বিচারে বাংলাদেশী নাগরিক হত্যা করা প্রায় নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার উপর আজকে পত্রিকার খবরটি আরও মর্মান্তিক, হৃদয়বিদারক! ফালানী নামের এক অসহায় কিশোরীকে বিএসএফ গুলি করে হত্যা করেছে। কাঁটাতারে ঝুলন্ত তার মৃতদেহের ছবি বিভিন্ন পত্রিকায় আজ বড় করে ছেপেছে। কী করুণ দৃশ্য! বুকের ভিতরটা চিনচিন করে ওঠে রাহনুমার। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন,

– এ এক বিচ্ছিন্ন ঘটনা।
কোনো প্রতিবাদ নেই দেশের পক্ষ থেকে। এতে বাংলাদেশ সরকারের অসহায়ত্বই ফুটে উঠেছে। দেশটা তাহলে আবারও পরাধীন হয়ে যাবে? আর ভাবতে পারে না রাহনুমা। পত্রিকা রেখে চোখ বন্ধ করে দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে থাকে।

কেয়ারটেকার আবুল হোসেন তাদের স্টেশন থেকে নিয়ে যেতে এসেছে। রাহনুমা যখন বাড়িতে পৌঁছায় রাত তখন এগারোটা। অনেকদিন পর চিরচেনা তার গ্রামের বাড়িতে পা রেখেই রাহনুমা আবেগাপ্লুত হয়ে ওঠে। আশেপাশের বাড়ি থেকে চাচাতো ভাই-বোনেরা রাহনুমার আগমনের অপেক্ষায় জেগেছিলো। রাহনুমাও আপনজনদের পেয়ে অনেক আনন্দিত। বাড়িটি গ্রামে হলেও এখন শহরের সবধরনের সুযোগ-সুবিধাই এখানে আছে। আবুল হোসেন ওদের থাকা-খাওয়ার সব ব্যবস্থাই করে রেখেছিলো। তাছাড়া প্রতিবেশীদের ঘর থেকেও এসেছে নানারকম তরকারি। নকিব, নওমি তো সবার এতো আন্তরিকতা দেখে বেজায় খুশি।

www.pathagar.com

সকালবেলা চললো রকমারি পিঠা-পুলির আয়োজন। গ্রামসম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজনদের অনেকেই দেখা করতে এলো। রাহনুমা তাদের অনেককেই চিনতে পারলেন না। কারণ মুরুব্বিদের চেহারায় এসেছে বার্ধক্যের ছাপ আর শিশু-কিশোররা পরিণত হয়েছে যুবকে। তাদের কয়েকজন হাতে করে নিয়ে এসেছে নিজেদের গাছের বিভিন্ন ফলমূল। রাহনুমা সেগুলো পেয়ে বেশ খুশি। গাছ থেকে পেড়ে আনা টাটকা ফলের স্বাদই আলাদা যেখানে নেই কার্বাইডের কোনো আতঙ্ক।

বিকেলে রাহনুমা তার বাল্যস্মৃতি বিজড়িত গ্রামে বেরিয়ে পড়লেন সদলবলে। গ্রামের অনেক কিছুতেই পরিবর্তন এসেছে। ছেলে-মেয়েরা বড় হওয়ায় এক এক বাড়িতে অনেক ঘর উঠেছে। কমে এসেছে আবাদযোগ্য জমি। গোটা গ্রামে বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে। বসেছে ধান ভাঙার মেশিন। তাই সেখানে নেই কোনো ধান ভানার শব্দ। রাহনুমা তার শৈশব ও কৈশোর এই গ্রামেই দৌড়ঝাঁপ করে কাটিয়েছেন। তাই তিনি তার চিরচেনা গ্রামের সেই সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য উদগ্রীব। কিন্তু কোথায় সেই সৌন্দর্য। সেই সাজানো গোছানো গ্রাম এখন কেমন অপরিচ্ছন্ন হয়ে গেছে। সবচেয়ে কষ্ট পেলেন যখন দেখলেন ছেলে-বুড়ো সবাই মিলে ঘরে ঘরে টেলিভিশনে সিনেমা দেখায় মত্ত। রাহনুমার মনে পড়ে তার ছেলেবেলার কিষাণীদের বৈকালিক ব্যস্ততার কথা। গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি লালন-পালনে কর্মব্যস্ত গৃহিনীরা। উঠোনের কোণে, দহলিজের আশেপাশে গৃহিনীদের সযত্ন হাতের সবজি বাগান। আর এখন কী দেখছে সে! বাড়ির আঙ্গিনাতে নেই তেমন কোনো সবজির ক্ষেত। রয়েছে ময়লা-আবর্জনায় ঘেরা পতিত জায়গা। যাও দু'একটি বাগান আছে তাতেও নেই কোনো যত্নের ছোঁয়া। মনে পড়ে গেলো মায়ের কথা। মা সারাদিনের সংসারের কাজ সেরে বিকেলের এই সময়টুকুতে বাড়ির আঙ্গিনায় কতোই না যত্নে সবজির চাষ করতেন। লাউ, কুমড়া, শিম, বেগুন, ঢেঁড়শ আরও কতোরকম সবজির গাছ। বাড়ির আনাচে-কানাচে মায়ের হাতের ছোঁয়ায় হয়ে উঠতো পরিপাটি। মাঝে মাঝে দলবেঁধে গৃহিনীরা বেড়াতেন এ বাড়ি ও বাড়ি, এতে করে সবার মাঝে গড়ে উঠেছিলো মায়ার বাঁধন।

দুপুরে খাওয়ার পর মাকে কখনও বিশ্রাম নিতে দেখেনি রাহনুমা। মা তখন ব্যস্ত থাকতেন মহিলা ও শিশুদের কুরআন শিখানো নিয়ে। বিনা বেতনে মায়ের এই

www.pathagar.com

ক্লাশে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও ছিলো অনেক। কুরআন পাঠদানের পাশাপাশি শালীনতাবোধ ও সুন্দর আচরণের শিক্ষাও তিনি দিতেন। সবাই মাকে খুবই মান্য করতো। তারা পাঁচ ভাইবোন সবাই মায়ের কাছেই কুরআন পড়া শিখেছে। কিন্তু বর্তমান অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাদের সময় কোথায়? টেলিভিশনের একের পর এক চটকদার অনুষ্ঠান তাদেরকে টিভিসেটের সামনে আঁকড়ে ধরে রেখেছে।

কয়েকদিন গ্রামে অবস্থানের পর রাহনুমা লক্ষ্য করলেন, গ্রামের মানুষের আচরণে পরিবর্তন এসেছে। হালকা, চটুল, বিজ্ঞাপন স্টাইলের কথাবার্তার ব্যবহার সর্বত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে। গ্রামের অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত মানুষের মাঝে টেলিভিশনের প্রভাবে তাদের স্বাভাবিক সরলতা, লজ্জাবোধে পরিবর্তন এসেছে দেখে মনটা খারাপ হয়ে যায় রাহনুমার। এর কারণও আছে। শিক্ষিত মানুষের তো কিছুটা হলেও বিচার ক্ষমতা আছে। যার মাধ্যমে তারা ভালো-মন্দের সীমানা নির্ধারণ করে নেয়। তাছাড়া তাদের সামাজিক পরিচিতি এবং অবস্থানের কারণে যে কোনো কাজ অবলীলায় করতে লজ্জাবোধ করে। অপরপক্ষে গ্রামের মানুষের সে বাধাটুকুও নেই। তাই তাদের মাঝে এই বল্গাহারা রূপ। বিষয়গুলো রাহনুমাকে খুব ভাবিয়ে তুললো। ভাবছেন দীর্ঘদিন গ্রামে না এসে ভুল করিনি তো? এই মানুষগুলো বিপথে চলে গেলে কী জবাব দেবো আল্লাহর কাছে? তাদেরকে কাছে ডেকে মহব্বত করে বুঝানো প্রয়োজন। তাদেরকে আলোকিত পথের সন্ধান দেয়া তো শিক্ষিত সমাজেরই দায়িত্ব। দীর্ঘক্ষণ একরাশ চিন্তায় ডুবে রইলেন রাহনুমা। তারপর ভাবলেন, আমাকে এখনই সিদ্ধান্ত নিতে হবে, নিতে হবে সঠিক পদক্ষেপ। ঢাকায় ফিরে গিয়ে পাঁচ ভাইবোন মিলে বসতে হবে। বাবা-মায়ের পরামর্শ ও ভাইবোনদের সহযোগিতায় গ্রামের মানুষগুলোকে আবারও জাগিয়ে তুলতে হবে। সুন্দর এ পৃথিবীর সুন্দর দিকগুলো তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে। জীবনের এই মূল্যবান সময়টাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য অনুপ্রাণিত করতে হবে। তাদেরকে কাছে ডেকে মহব্বত নিয়ে বুঝালে নিশ্চয়ই তারা বুঝতে পারবে, কারণ তারা তো আমাদেরই পরমাত্মীয়। এ জন্য মায়ের বাসাই হবে সকল কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

টার্নিং পয়েন্ট

তাহমিনা ইয়াসমীন